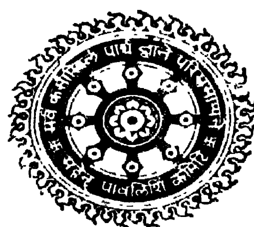
কলিকাতার

পুরাতন কাহিনী ও প্রথা



মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩
শ্রীপঞ্চমী, ২৫, মাঘ ১৩৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ :
৫ই অক্টোবর ১৯৭৫
১৫ই আশ্বিন ১৩৮২

মুদ্রাকর :
শ্রীজয়ন্তকুমার দাস
বিবেকানন্দ প্রেস
১।১ই, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

উৎসর্গ

পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের

বিশেষ স্নেহধন্যা, অশেষ শ্রদ্ধাবতী

গোপালের মা'র (**শ্রীমতী শবাসনা চক্রবর্ত্তি**) নামে

উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

ইংরাজী ১৯২৯ সালে গ্রন্থকার কলিকাতার পুরাতন কথা নাম দিয়া কয়েকটি অধ্যায়ের ভাষণ দিলেন। পরে দেখা গেল কলিকাতার পুরাতন কথা ভাষণের সময় প্রাচীন ভারতের ও অন্যান্য স্থানের সংশ্লিষ্ট কাহিনী না বলিলে ভাষণ প্রাঞ্জল হয় না। যদিও কলিকাতার পুরাতন কথা ও প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী একই সঙ্গে লেখা হইল, গ্রন্থকার বলিলেন "প্রকাশকালে ভাষণগুলি আলাদা ভাবে প্রকাশ করিবে।" গ্রন্থকারের নির্দেশমত, প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী, ২৭. আষাঢ় ১৩৭১, ইং ১১ই জুলাই ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে বাকি অংশ কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা নামে প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য গ্রন্থে কলিকাতার বহু পুরাতন সামাজিক প্রথা ও পূজাদির রীতিনীতি প্রভৃতি, ও অন্যান্য প্রদেশের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে, এবং দেব, দেবী পূজার বিভিন্ন মতাবলম্বীরও উল্লেখ আছে।

গ্রন্থ প্রকাশনায় নানা কারণে, এতদিন বিলম্ব হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত ও সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৯ প্রকাশক

ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথার' পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণে কিছু বিলম্ব ঘটিল। বর্তমান সংস্করণে—মূল পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া—তথ্যগত ও বিষয়গত সামান্য অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে মুদ্রণপ্রমাদ ও অন্যান্য ভ্রমসংশোধনের আপ্রাণ প্রয়াস পাইয়াছি। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি রহিয়া গেল সেইজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি, কাগজের মূল্য, বাঁধাই ও মুদ্রণকার্যের ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সংস্করণে পুস্তকের মূল্য সামান্য বর্ধিত করা হইল। গ্রন্থটি সুধী পাঠকসমাজে আদৃত হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব।

মহালয়া

১৮ই আশ্বিন, ১৩৮২ প্রকাশক

৫ই অক্টোবর ১৯৭৫

কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা

সহরের অবস্থা

কলিকাতার সহর এখনকার হিসাবে দুই আনা বা ছয় পয়সার সহর ছিল। এখনকার Oxford Mission কলুবাড়ী ছিল, তাহার পর হাড়ীপাড়া। মহেন্দ্র গোঁসাই গলিটা ডোমপাড়া ছিল। মধু রায় গলি গয়লাপাড়া ছিল এবং দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড একটা মাঠ ছিল তাহাতে মরা গরু, বাছুর ফেলিয়া দিত। সে একটা গো-ভাগাড় ছিল। দিনে শকুনীর উৎপাত, রাত্রে শেয়ালের উৎপাত। হাতী-বাগান অরণ্য বাঁজবন ছিল। লোকজনের বাস ছিল না। প্রকাণ্ড মাঠ, মাঝে মাঝে ঝোপ, ডোবা ও কাঁটানটের ঝাড়, জনকতক হাড়ী বাস করত। রাস্তায় অন্ধকারে একলা যাইলে জিনিসপত্র কাড়িয়া লইত। গ্রে ষ্ট্রীট বাহির হইবার পর, সে বড় মাঠটা টুকরা টুকরা করিয়া বিক্রয় হয় এবং লোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জমি খরিদ করিয়া বসতি করিতে লাগিল। এইরূপে বসতি হইল। আমরা ছেলেবেলায় ওটাকে অরণ্য বাঁজবন বলিতাম। নিমতলার দিকে বাঁধান ঘাট কিছুই ছিল না, আগে আনন্দময়ীর তলাতেই ঘাট ছিল এবং একটা চাঁদনী বহুদিন ছিল; সেখানে নাপিতেরা ক্ষৌরি করিত এবং মাড়েদের গঙ্গাযাত্রীর ঘর এখনও আছে। সেটা এখন কাঠের গুদাম হইয়াছে। আনন্দময়ীর তলার ঘাট আমাদের কিছু আগে; কারণ মা যখন ছোট তখন চোরে মার পা থেকে মল খুলিয়া লইয়াছিল। আমরা যখন ছোট তখন বাঁধান ঘাট ছিল। তখন মড়াপোড়াবার ঘাট ছিল না। মড়াপোড়ানোর কলটার চিমনি অনেকদিন ছিল এখন আর নেই কিন্তু কলে মড়াপোড়ানো হয় নাই। কল তৈয়ারী হইয়াছিল মাত্র। গঙ্গার কিনারাটা গড়েন ছিল। ইট, পাটকেল

ও মড়ার হাড় চারিদিকে ছড়ান থাকিত এবং অনেক শকুনি, হাড়গিলে আশে পাশে বসিয়া থাকিত। অসাবধানে চলিলে পায়ে মড়ার হাড় ফুটিয়া যাইত। আমার পায়ে একবার ফুটিয়া ঘা হইয়াছিল। তখন কাঠ, বাঁশ দিয়া মড়া খানিক পোড়ান হইত, বাকিটা শকুনি খাইত। সে অতি ভীষণ দৃশ্য ছিল, এখনও মনে করিলে ভয় হয়। শ্মশান তো প্রকৃতই শ্মশান ছিল! গঙ্গার কাঠের পোল ও নিমতলার পাকা ঘাট একসঙ্গে হইয়াছিল। তাহার পর গঙ্গার কিনারা বাঁধান শুরু হইল, আমরা ছেলেবেলায় বাটীর গাড়ি করে নূতন পোল ও মড়াপোড়ার ঘাট দেখিয়াছিলাম—১৮৭৩-'৭৪ সালে এটা হইয়াছিল। তখন আমি ছোট ছিলাম।

ষ্টীমার বা লোহার জাহাজ

ষ্টীমার বা লোহার জাহাজ ছিল না। তখন পাল তোলা কাঠের জাহাজ আসিত এবং অনেক গোরা খালাসী থাকিত। জাহাজেতে ময়ূর বা পরীর বড় বড় কাঠের পুতুল থাকিত এবং তাহাতে সব সোনার পাত মোড়া। আমরা চলতি ভাষায় সে সকলকে ময়ূরপঙ্খী জাহাজ বলিতাম। সিমলা হইতে জগন্নাথের ঘাট পর্যন্ত খুব উঁচু বাটী ছিল না। আমরা ছাতে উঠে দেখতাম জাহাজের মাস্তুল-গুলোকে যেন একটা শুকনা জঙ্গল দেখাইত। এতবড় জাহাজ না হলেও তখন সংখ্যাতে ঢের বেশী ছিল। জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার জিনিসপত্র বিক্রয় হইত। তখনকার দিনে জাহাজের এক-রকম গোল লণ্ঠন বিক্রয় হইত। তাহাতে তেল বা বাতি দিয়া জ্বালান হইত। চারিদিকে তারের বেড়া থাকিত হাজার ঝড় হলেও তাহা নিভিত না। আমাদের ঘরে সেই রকম লণ্ঠন ছিল। এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা তাহাকে জাহাজী লণ্ঠন বলিতাম।

কলিকাতার শহরে ঘোড়ার গাড়ীর প্রথা খুব কম ছিল। দু-চার

ঘর বড়মানুষের বাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ীর চলন ছিল। সাধারণ ঘরে পাল্কি থাকিত। তখন মেয়ে-সওয়ারীরা ঘোড়ার গাড়ী চড়িত না। বড় মানুষের মেয়েরা পাল্কিতে যাইত। পাল্কিতে ঘেরাটোপ দেওয়া থাকিত। সাধারণ ঘরে থাকিত না। বাবুরা গদিবিছানায় শুইয়া পাল্কিতে অফিসে যাইত। আমাদের বাটীতে প্রথমে পাল্কি ছিল পরে ঘোড়ার গাড়ী হয়। পাল্কি থাকিলে এই সুবিধা যে চারিটা চাকর পাওয়া যাইত। তারা জল তুলিত, তামাক সাজিয়া দিত, কাঠ কাটিত, বাটী পাহারা দিত, লোকজনকে ডাকিয়া আনিত ও অনেক কাজে লাগিত। ক্রমে ক্রমে পাল্কির রেওয়াজ উঠিয়া গিয়া গাড়ীর রেওয়াজ হইল।

জ্বালানি-কাঠের প্রথা ও প্রথম কয়লা প্রচলন

আমাদের ছেলেবেলায় বাটীতে কাঠের জ্বালে রান্না হইত। খালধার থেকে গাড়ী করে সুঁদুরীকাঠ আসিত এবং তিন জন উড়ে কাঠুরিয়া আসিয়া বড় বড় কুড়ুল দিয়া চেলা করিয়া দিত। সেই চেলাকাঠগুলি চৌকো করিয়া মাঝখানে ফাঁক চেরী করিত। এইরূপ কাঠ শুকাইয়া যাইলে তুলিয়া রাখা হইত। সকালে রাঁধিবার সময় চাকরেরা সেইসব কাঠ সরু চেলা করিয়া দিত এবং তাহাতে উনান ধরান হইত। তখনকার দিনে পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই। ইংরাজী ১৮৭৫ বা '৭৬ সালে গ্যাস ঘরেতে পাথুরে কয়লার চলন হইল এবং লোকের বাটীতে গাড়ী করিয়া বিনামূল্যে দিত। কিন্তু উনান কি রকম করিয়া জ্বালান হইবে তাহা জানা ছিল না। অনেক কষ্ট, কল্পনা করিয়া লোহার সিক দিয়া উনান হইল। ক্রমে কয়লার এক আনা করিয়া মণ হইল এবং সাধারণে প্রচলন হইল। কিন্তু এখন জ্বালাইবার সুঁদুরীকাঠ (ইন্ধন) প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বর্ণনা

তখনকার দিনে কলিকাতার আচার-ব্যবহার খাওয়া-দাওয়া এবং শহর কি রকম ছিল বলা আবশ্যক তাহা না হইলে তখনকার দিনের সকল কথা বুঝা যাইবে না। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে কিছু দেওয়া হইতেছে। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না হয় এইজন্য অল্প করিয়া সকল বিষয় দেওয়া যাইতেছে।

কলের জলের কথা

তখনকার দিনে কলের জল সবে হইয়াছে এবং সব বাটীতে নল বসে নাই। সীসের পাইপ করিয়া রাস্তা থেকে কলের জল আসিত। কিন্তু জলে গেঁড়ি থাকিত। এইজন্য মাঝে মাঝে পাইপ বন্ধ হইয়া যাইত মাঝে মাঝে রাস্তার চাপে পাইপ তুবড়াইয়াও যাইত। সকল বাটীতে কলের জলের প্রচলন হয় নাই। কলের জল হইবার পূর্বে আমাদের বাটীতে রাঁধিবার ও অন্য কাজের জন্য পাতকুয়ার জল ব্যবহার হইত। বাড়ীতে তিনটা পাতকুয়া—রান্নাঘরের নিকট একটা, ভিতরের উঠানে একটা এবং সদরবাড়ীতে একটা পাতকুয়া ছিল। ভিতরকার পাতকুয়াতে একটা কচ্ছপ ছিল। কচ্ছপ থাকিলে তাহারা পোকা খাইয়া ফেলে এবং জল পরিষ্কার রাখে। পশ্চিমে অনেক জায়গায় জলেতে ব্যাঙ রাখিয়া দেয় এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে ব্যাঙ পোকা খায়। নিত্য জল তোলা হইত বলিয়া জল ভাল ছিল এবং খাইবার জন্য চাকরেরা হেদুয়া হইতে বাঁকে করিয়া জল আনিত। তখনকার দিনে হেদুয়ার জল ছিল উৎকৃষ্ট। ঠাকুরঘরে দুটো বড় বড় ঢাকাই জালা ছিল। তাহাতে ভারীরা গঙ্গা থেকে জল আনিয়া রাখিত। কিন্তু সেই গঙ্গাজলে পোকা হইত না। হেদুয়ার পুকুরের জল কিছুদিন রাখিলেই পোকা হইত পরে কলের জলও জালায় রাখিলে সরু সরু পোকা হইত। স্নানের জন্য অনেকেই পাতকুয়ার জলে

স্নান করিত এবং যাহারা পারিত তাহারা নিকটবর্তী কোন পুকুরে স্নান করিয়া আসিত। আমরা মাধব পালের পুকুরে স্নান করিতাম। হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার ভোলানাথ পালের পুকুরে সকলে স্নান করিত। সকালে পুকুরে স্নান করা ও সাঁতার কাটা একটি প্রথা ছিল এবং সকলেই কিছু কিছু সাঁতার কাটিতে পারিত। পরে কলের জল হইলে সেটা কেবল খাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, স্নান পাতকুয়া বা অন্য পুকুরে হইত।

শীতের কথা

আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি কলিকাতায় দারুণ শীত পড়িত। রাত্রিতে শোবার সময় একটা মালসা করে উনান থেকে এক মালসা আগুন নিয়ে ঘরে রাখা হইত। সমস্ত ছোট ছেলেরা সেই আগুন সেঁকে তারপর লেপের ভিতর ঢুকিত। দরজা জানালায় গনিক্লথ (Gunny cloth) ডবল করে পর্দা দেওয়া হইত এবং ঘরে আগুন থাকা সত্ত্বেও লেপের ভিতর হি-হি করে কাঁপতুম। তখন কলকাতায় বাড়ী ঘর সামান্য ছিল, সর্বত্র পুকুর, কানাচ ও বাগান থাকায় হাওয়াটা জোরে আসিত এবং ঠাণ্ডাটা বড় বেশী হইত। গোলপাতা বা খোলার ঘর এইটা ছিল সাধারণ গৃহ। কোঠাবাড়ী তখন অল্প লোকের ছিল। এত লোকজন, কয়লার আগুন, গ্যাসের তাত না থাকায় শহর এত গরম হইত না, সেইজন্য শীত বেশী বলিয়া বোধ হইত। আমাদের পাড়ার বৃদ্ধ মধু মুখুজ্যের নিকট শুনিতাম যে হুগলীতে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়িত। খড়ের চালার উপর সকালবেলা যেন চুন ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, এইরূপ তিনি বাল্যকালে দেখিয়াছেন এবং খড় বিছিয়ে সরাতে জল দিয়া ফাঁকে রাখিলে তাহা বরফ হইয়া যাইত। তবে আমাদের বাল্যকালে বরফ পড়া দেখি নাই। কিন্তু দারুণ শীত ভোগ করিয়াছি।

জামা পিরান

তখন এত জামা পিরানের প্রচলন ছিলনা। বাটীতে খালি গায়ে ও পায়ে থাকিতাম। বড় হ'লে ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে দিয়াছি। তখন এর দাম অতি সামান্য ছিল। ছোট চটি ছয় আনা বড় চটি দশ আনা মাত্র ছিল। নিমন্ত্রণ খাইবার সময় জামা ছিল চীনের কোট। অর্থাৎ বুকটা লম্বা চেরা তাতে গোল গোল হাড়ের বোতাম কাপড় দিয়ে মোড়া। কলিকাতার হাড়-কাটা গলিতে এই বোতাম তৈরী হইত। এইজন্য স্থানটির নামও তাহাই হইয়াছিল। কেহ কেহ বা পিরানও পরিতেন। কিন্তু বৃদ্ধেরা বেনীয়ানও পরিতেন অর্থাৎ বুকটা দো-ভাঁজ করা ফিতা দিয়া বাঁধা হইত। বেনীয়ান আমাদের ভাল লাগিত না। সেইজন্য চীনের কোট পরিতাম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন জামা তৈয়ারী হয় নাই। আমরা যখন খুব শিশু আমাদের দোলাই পরিতে দিত না। কাপড়ে আগুন লাগিয়া যাইবার ভয় ছিল। আমাদের বনাতের কোট-ক্লোক পরাইয়া দিত। একটা বনাতের ঘেরা, সেইটা সমস্ত শরীরকে আবরণ করিত এবং গলাতে মখমলের পটি এবং সেই জায়গায় একটা পিতলের বাহারী আংটি দিয়া বন্ধ হইত। ছোটদের গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা আবরণ হইত। কিন্তু হাত নাড়িবার উপায় ছিল না। এই জন্য ক্লোক দেখিলে আমাদের বড় ভয় হইত।

কলেরার কথা

তখনকার দিনে কলিকাতায় কলেরার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। কলিকাতায় গর্মিকালে পুকুর পাতকুয়া শুকাইয়া যাইত। সাধারণ লোক যেখান-সেখানকার জল খাইত। এইজন্য কলেরাও ঢের হইত। কিন্তু কলের জলের পর হইতে কলেরায় মৃত্যু ঢের কমিয়াছে। আমরা ছেলেবেলায় কলেরায় মরিতে ঢের দেখিয়াছি।

মাছির কথা

কলিকাতায় চারিদিকে নালা, পগার ও নর্দমা ছিল এবং চারিদিকে বাঁশঝাড়, কেলে হাঁড়ি ও আবর্জনা পড়িয়া থাকিত ; এইজন্য গর্মিকালে অতিশয় মাছির প্রাদুর্ভাব হইত। গর্মিকালে বিশেষতঃ আমের সময় মাছি খাইয়া প্রায় বমি হইত এবং রাত্রিতে মশার উৎপাতও খুব ছিল। পূর্বেকার হিসাবে এখন মাছি নাই বলিলেই হয় এবং মশা খুব কমিয়াছে : তখনকার দিনে খাইবার সময় একজনকে পাখা লইয়া হাওয়া করিতে হইত, না হইলেই বিপদ।

শিয়ালের কথা

কলিকাতায়, আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি, বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। সর্বত্র এদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শেয়ালের উৎপাত ছিল। এমন কি রাত্রে আমাদের উপরের ঘরে গিয়া তক্তপোষের নিচে থেকে হাঁড়ি চুরি করিয়া লইয়া পলাইত। হাঁড়ি মাথায় করে দুপায়ে তাকে ধরে বেশ সতর্কে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইত। পরদিন কানাচে খালি হাঁড়ি পাওয়া যাইত। কখনও কখনও ছোট ছেলেকেও লইয়া যাইত। ভাদ্রমাসে হন্যে শিয়াল হইত এবং দু-একজনকে কামড়াইয়াছে প্রায় শোনা যাইত। আমরা যখন একটু বড় হইয়াছি তখন কোথা থেকে নেড়ে কুকুর এল। নেড়ে কুকুরের সংখ্যা কয়েক বৎসরের ভিতর বাড়িয়া গেল। শেয়ালেরা লড়াইএতে কুকুরের সঙ্গে পারিল না। কেহ মরিয়া গেল, কেহ পলাইয়া গেল। তাহার পর কুকুরের সংখ্যা বাড়িল। এত বাড়িল যে ট্যাক্স অফিস হইতে কুকুর মারার হুকুম হইল। আগেকার হিসাবে কলিকাতায় শিয়াল একেবারেই নাই এবং নেড়ে কুকুরের সংখ্যাও অতি অল্প।

বাঁদরের কথা

খালধার ও মানিকতলায় তখন সব বাগান ছিল। বড় বড় গাছ

থাকায় অনেক বাঁদর থাকিত এবং হনুমানও কিছু কিছু থাকিত। সিমলাতে অনেক জায়গায় বড় বড় তেঁতুল, অশ্বত্থ ও নারিকেল ইত্যাদি অনেক প্রকারের গাছ ছিল। পুকুর পাড় হইলেই সেখানে নারিকেল গাছ দিতে হইত। অশ্বত্থ গাছ, বট গাছ পূর্বের লোকেরা প্রতিষ্ঠা করিত এবং পগারের ধারে সেকালে তেঁতুল গাছ অনেক ছিল। বাঁশঝাড় তো আনাচে-কানাচে হ'ত। মাঝে মাঝে খাল ধার থেকে বাঁদর এসে বড় উৎপাত করিত। বড়ি শুকুতে দিলে তা খাইয়া যাইত, আম নষ্ট করিত, তেঁতুল পাতা খাইত এবং শুঁটি নষ্ট করিত। এইজন্য সব ছেলেরা বাঁদর মারিত ও হনুমানকে তাড়া করিত। এখন সেসব কিছুই নাই কিন্তু আগে বাঁদর ও হনুমান বড় উৎপাত করিত।

বাদুড়ের কথা

আমাদের ঠাকুর দালানে অনেক বাদুড় ঝুলিত এবং কিচমিচ করিয়া সব সময় আওয়াজ করিত। যে সকল বরগাতে বাদুড় থাকিত তাহার নীচে মেঝেয় নানারকম ফলের বিচি ছড়াইত ও নানারকমে ময়লা করিত। এইজন্য আমরা সকলে ঢিল মেরে মেরে বাদুড় তাড়াইতাম। এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষ ছিল। তাহার টিপ অতি নিশ্চিত ছিল। টিপ করিয়া ঠিক বাদুড় মারিত। তাহার পর বাদুড়রা কিচমিচ করিয়া সন্ধ্যার সময় উড়িয়া যাইত। এটা একটা খেলার ভিতর ছিল, তাড়ানোটা খেয়ালের ভিতর ছিল না। বুড়িরা বলিত বাদুড় যেখানে বাস করে সেই জমির খাজনা সে নিত্য দেয়, অর্থাৎ ফল আনিয়া খায় আর আঁটি ফেলে। বুড়িরা আরও বলিত যে ওরা বলি রাজার প্রজা। রাজা পাতালে থাকে, সেইজন্য ওরা নিচের দিকে পা রাখে না, রাজার সম্মানের জন্য হেঁট মাথা করিয়া ঝোলে। বাদুড়রা বড় পুণ্যাত্মা। আমরাও সেইজন্য মাঝে

মাঝে বাদুড় দেখে প্রণাম করিতাম এবং বুড়িরা কাছে না থাকিলে পাঁচ ছয় জনে মিলে বাদুড়কে ঢিল মারিতাম। চামচিকে সকল বাটীর বারান্দার নীচে থাকিত. কলিকাতায় এখন বড় একটা বাদুড় চামচিকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরস্পর সম্বোধন করা—"বাবু" কথা চলিত না

ছেলেবেলায় আমরা সকলকে একটা সম্পর্ক করিয়া ডাকিতাম। পিসে, জ্যাঠা, মাসি ইত্যাদি, ইহাতে জাতি-বর্ণের কোন কথাই ছিল না। পাড়া প্রতিবেশীর সহিত একটা সম্পর্ক হইত। বৃদ্ধদিগকে মুখুজ্যেমশাই, ঘোষমশাই, বোসজামশাই ইত্যাদি বলিয়াই সম্বোধন করা হইত। এমনকি চাকরদেরও একটা সম্পর্ক দেওয়া হইত। ইহাতে পরস্পরের ভিতর একটা গার্হস্থ্য সম্পর্ক ছিল এবং আবশ্যক হইলে সকলে সহায় হইত। যেমন পাড়ায় কাহারও বাড়ীতে জামাই আসিলে সে সম্পর্ক হিসাবে অনেকের ভগ্নীপতি হইত এবং আমোদ-আহ্লাদ করা হইত এবং জামাই একদিন সকলকে খাওয়াইত; সে পাড়ার সকলেরই জামাই হইত। বাবু সম্বোধন ছেলেবেলায় আমরা শুনি নাই. এটা ইংরাজী পড়ার দরুন হয়েছে। বাড়ীর পূজারী পুরোহিত, ইহাদিগের সহিতও জ্যাঠা খুড়া সম্পর্ক চলিত।

পত্রবাহক নাপিতে

এখন কোনো শুভকার্যে ডাকযোগে চিঠি পাঠান হয় এবং ইংরাজী কাগজে কালি দিয়া লেখা হয়. আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি এরকম ছিল না। দেশী তুলোট কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা হইত এবং কাগজখানি চারিদিকে লাল সুতা বেঁধে কিছু মিষ্টির সহিত নাপিতের হাতে যাইত। ইহাতে নাপিতের কিছু প্রাপ্য হইত। পাছে নাপিত হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেয়ে ফেলে এইজন্য

হাঁড়ির মুখে সরাটা উল্টে দিয়ে ময়দা গুলিয়া চারিদিকে লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাকে ওলপ দেওয়া বলে। এইজন্যে মেয়েরা পরস্পর ঠাট্টা করিত। "ওলো, তুই যে মুখে ওলপ দিয়েছিস, তোর মুখে রা নাই।" আমাদের বাড়ীর নাপিত পূজার সময় একটি টাকা, ধুতি-চাদর এবং চড়কে একটা টাকা—এই হল তাহার বার্ষিক বেতন। বাড়ীতে যত লোক আসিত সে সকলকে ক্ষৌরি করিত এবং ৯-টা পর্যন্ত তামাক দিত। বুড়ো যোদো নাপ্তের সকালবেলায় আর অন্যত্র যাওয়া হইত না। কিন্তু এইরূপে তত্ত্ব লইয়া যাওয়া এবং নতুন জামাই আসিলে তাহাকে তেল মাখান এবং সর্বদা ভাঁড়ার ঘর হইতে সিধে পাওয়া ও আগন্তুক মক্কেলদের কাছ থেকে বকসিস পাইয়াই তাহার সুশৃঙ্খলে চলিত। অন্যত্র ক্ষৌরি করিবার আবশ্যক হইত না। এইরূপে অনেক গরীবলোক এক-একটা বংশ ধরিয়া প্রতিপালিত হইত। মাইনে নামমাত্র ছিল তবে সিধেটা প্রায়ই পাইত।

দুপুরবেলা মেয়েদের একসঙ্গে হওয়া

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে পাড়ার সব মেয়েরা, গিন্নীরা ও বউরা ভিতরকার পথ দিয়ে উপরের দালানে একসঙ্গে হইত। তখন সব বাড়ীতে যাইবার ভিতরকার পথ ছিল। সদর দরজা দিয়া মেয়েরা আসিত না। প্রথম প্রশ্ন উঠিত সেইদিন কে কি রেঁধেছে। যারা সম্পর্কে বউ তারা শাশুড়ীর সম্মুখে সংযত থাকিত এবং যে যা রেঁধেছে সে বিষয়ে বলিত। তাহার পর সোনামুগ ডালে কি জিনিস দিতে হয় তার প্রশ্ন উঠিত। সোনামুগের ডালে একটু দুধ দিতে হয়। হলুদের তেমন প্রয়োজন নাই। থোড়ের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, এইসবেতে কি-জিনিস কি-পরিমাণে দিতে হয় তাহার প্রশ্ন উঠিত। বৃদ্ধাদের নিকট হইতে অল্পবয়স্কারা শিখিয়া লইত। ইহা শিক্ষার বিশেষ উপায় ছিল। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিটি কলেজের লেকচার হলে এই

কথাটি উল্লেখ করেন এবং আনন্দ করেন। আমি উপস্থিত ছিলাম। তাহার পর অসুখের কথা উঠিত। কি অসুখের কি ঔষধ যথা কাশিরোগে বুকে ও রগে পুরানো ঘি মালিস, তাহাতে শিশুরা আরোগ্য লাভ করিত। তাহার পর কথা উঠিত কাহার বাড়ীতে কষ্ট এবং কাহার কাহার ছেলেরা চাকুরী অভাবে বসিয়া আছে। সকলের কষ্টের কথা বলা হইলে গিন্নীরা সময়মত কর্তার কানে তুলিত যে অমুকদের বাড়ীতে বড় কষ্ট। অমুকের মেয়ে বড় হইয়াছে, বিবাহ হয় নাই, ছেলে বসিয়া আছে, এইরূপে অন্দরবাটী হইতে কথা সদর-বাটীতে আসিত এবং সদরবাটীতে পাড়ার বুড়ারা উপস্থিত থাকায় তাহার আলোচনা হইত এবং উপায় নির্দ্ধারিত হইত। এইরূপে পাড়ার প্রত্যেকের খবর প্রত্যেকে জানিত এবং পাড়াটাই একটা পল্লী হিসাবে ছিল। এই হইল আমাদের ছেলেবেলায় পাড়ার কথা। মেয়েরা কাপড়ের খুঁটে করে পান আর দোক্তা লইয়া আসিত এবং যাহাদের বাটী যেত তাহারাও পান দোক্তা দিত। যাহা হউক দোক্তা দিয়া পান ট্যাকে গুঁজিয়া দু-একটা পিচ ফেলিয়া তাহারা গল্প করিত। তখন পাথুরে চুন ছিল না, ঝিনুক পোড়া বা জোংড়া চুন ছিল। এইজন্য অনেক সাত্ত্বিক বিধবারা হাড়পোড়ান চুন খাইত না। অনেক বিধবারা তাই গোলপাতা ও খড় পুড়িয়ে দোক্তার সংগে হিন্দুস্থানীদের খৈনী খাবার মত মুখে গুল দিত। আমার মা ও দিদিমা এই গুল মুখে দিতেন।

যজ্ঞির রান্না

আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি বাটীতে কোন যজ্ঞি হইলে গিন্নীরা নিজেরাই রাঁধিতেন। যিনি যে-বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী তিনি সেই বিষয় রাঁধিতেন এবং তাঁহার হাতের রান্না খাইয়া সকলে বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন। পাচক-ব্রাহ্মণের প্রথা ছিল না। তখন ভাতের ব্যাপার। খাওয়া-দাওয়া দুপুরবেলা হইত এবং অনেক

লোক নিমন্ত্রিত হইত। লুচির প্রচলন খুব কমই ছিল। কায়স্থ বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আহার করিলে লুচির ব্যবস্থা হইত কিন্তু ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সকলে আহার করিতে পারেন এইজন্য সেখানে ভাতের ব্যাপার চলিত। তখন কাঠের উনান, এইজন্য মাটির হাঁড়িতে এবং মাটির খুরিতে ব্যঞ্জনাদি তৈয়ারী হইত। তাহা খাইতে অতি সুস্বাদু হইত। সন্দেশ, পানতুয়া মোটামুটি ছিল কিন্তু রসগোল্লা ও বহুবিধ সন্দেশ ঢের পরে হইয়াছে। ক্ষীরের খাবার প্রচলিত ছিল না এবং লোকেও পছন্দ করিত না। যাহারা বিশেষভাবে খাওয়াইত তাহারা বড়বাজার হইতে আনাইত। তিলকুট তখন প্রচলিত ছিল এবং চন্দ্রপুলির বহুল পরিমাণে প্রচলন ছিল। নিরামিষ তরকারী ও মাছের তরকারী এইটাই মধ্যাহ্নভোজের বিশেষ অঙ্গ ছিল। কিন্তু সে সময় বড় দলাদলি ছিল।

মুরুব্বী দেখা দিল

এক প্রকার মুরুব্বী দেখা দিয়াছিল যাহাদিগকে ভোজপণ্ডে বলিত অর্থাৎ যাহাদের ভোজন পণ্ড করবার কাজ ছিল। তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া লোকেদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের বংশের কোন কুৎসা রটনা করিয়া সমস্ত পণ্ড করিত। মুরুব্বী না খাইয়া যাইলে অপরেও খাইত না। এইরকম দু-চারটী ব্যাপার হওয়ায় পাচক-ব্রাহ্মণের প্রথা উঠিল। তাহারা রন্ধন তেমন করিতে না পারিলেও ভোজ-পণ্ডেকে গালাগালি দিতে বিশেষ পটু ছিল। ভোজপণ্ডেরা দু-চার জায়গায় অপমানিত হওয়াতে তাহাদের প্রতাপ কমিয়া গেল পরে লোপ পাইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গিন্নীদের হাতের সোনামুগের ডাল, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট উঠিয়া গেল। কলিকাতায় গিন্নীদের ভোজ-রন্ধন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার এই একটি কারণ। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে পারে সেখানে পাচক-ব্রাহ্মণের প্রতাপ নাই।

ফলার লুচির ব্যাপার

পূর্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইলে ফলার করান হইত। ভাজা চিঁড়ে, ঘি, মোণ্ডা এবং কোন কোন স্থলে খই, দই ইত্যাদি দিয়া ফলার করান। সেটা আমাদের সময়কার বহু পূর্বের কিন্তু কথাটা তখনও ছিল। আমাদের খুব শৈশবে ব্রাহ্মণেরা লুচি, চিনি আর সন্দেশ, তরকারী একেবারেই ব্যবহার করিতেন না। তবে আমরা যখন পাঁচ-ছ বৎসরের তখন এইরূপ প্রচলিত ছিল, যথা বড় বড় লুচি, বিলাতি কুমড়া, পটল, মটর ভিজা দিয়া ছক্কা হইত। তাহাতে নুন দেওয়া হইত না। নুন যার যার পাতে দেওয়া হইত। নুন দেওয়া হইলে উৎসৃষ্ট বলিত। লুচি আর ছক্কা এই ছিল তখন প্রধান আহার, মিষ্টান্ন অনেক প্রকার হইত, যথা খাজা, গজা, কচুরী, নিম্‌কি, পানতুয়া, মতিচুর, কাঁচাগোল্লা। পরে নিমন্ত্রণ বাটীতে পাতেতে একখানি সরা করে এইসব মিষ্টান্ন পৃথকভাবে দেওয়া হইত। কেহ কেহ বা মিঠাই ও সন্দেশের থালা আলাদা করিত। একটা কু-প্রথা ছিল কেহ কেহ এই সরা লইয়া বাটী আসিতেন। মেয়েরা আবার ভাল বেনারসী শাড়িতে এই সরাখানি বাঁধিয়া আনিতেন। তাহাতে পানতুয়ার রসে তাহাদের যে বেনারসী শাড়ি নষ্ট হইত সেদিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। খাবার তোলা বড় আনন্দের বিষয় ছিল। পরিবেশনের সময় আর একটা কু-প্রথা ছিল, যাহারা মিঠাই পরিবেশন করিত তাহারা অধিকাংশ সময় ভাঁড়ার থেকে মিঠাই আনিয়া উড়া পাচার করিত। পাড়ার প্রতিবেশী এই কাজ করিতেন, দেখলেও কিছু বলিতে পারা যাইত না, আমার চোখের সামনে এমন হয়েছে। আমি কর্তাদের বলে দিয়েছি কিন্তু তাঁহারা চুপ করিতে আদেশ দিয়াছেন। বে-বাড়ীর পংক্তির সময় অনেক দুষ্ট লোক যাইত। তাহারা বড় জুতা চুরি করিত। এইজন্যে একজন চাকর লইয়া

যাইতে হইত। তাহার জিম্মায় জুতা রাখিতে হইত। আমাদের একটা পুরানো গান ছিল তার শেষ লাইন হচ্ছে, "কর্মবাড়ী করে জুতা চুরি।"

পাঁপড়ে হিং দেওয়া থাকে এইজন্য তখন পাঁপড় ভাজার প্রচলন ছিল না। হিং দেওয়া জিনিস সাধারণ লোকে খাইত না। আলুর তখন প্রচলন হয় নাই। এইজন্য আলুর তরকারী হইত না। আলু তখন কাঠের জাহাজে করিয়া বোম্বাই হইতে আসিত এবং সেইজন্য বোম্বাই আলু বলিত। ক্রমে বাংলায় আলুর চাষ হইল। ফুলকপি, বাঁধাকপি তখন দুষ্প্রাপ্য, ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত হইত না। ক্রমে পটল ও শাক ভাজা চলিল। এখন তো খাবার অসংখ্য রকম এবং বর্ণনা করা যায় না। এসব ধীরে ধীরে হইয়াছে। এই সকল আমাদের শৈশবের কথা।

সকালে জলখাওয়া

সকালে আমরা বাসী রুটি ও কুমড়ার ছক্কা খাইতাম। কুমড়ার ছক্কা বাসী হইলে খাইতে বড় ভাল লাগিত। তখনকার দিনে খাঁটি তেল ছিল। কাঠের জ্বালে মাটির পাত্রে রাঁধা হইত। ঘি তখন টাকায় পাঁচপো বা দেড়সের ছিল তাই তরকারীতে একটু ঘি পড়িত এবং গিন্নীরাও রাঁধিত ভাল। রুটি না থাকিলে মুড়ি-মুড়কি জল খাইতাম। এক পয়সার মুড়ি এক গাদা ছিল। কিছু আমরা খাইতাম এবং কিছু কাককে দিতাম। এক পয়সায় মুড়ি ছোট ছেলে খাইতে পারিত না। তখন এত খাবারের দোকান ছিল না। সিমলা বাজারে একখানি দোকান ও বলরাম দে ষ্ট্রীটে একখানি। জিভেগজা, ছাতুর গুট্‌কে গজা, কুচো গজা, চৌকো গজা, গুট্‌কে কচুরী ও জিলাপি ছিল তখন খাবার। এখন সেসব জিনিস নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া লোকে অবজ্ঞা করে। আমরা যখন বড় হইয়াছি তখন খাবারের ছয় আনা

সের। পরে একজন সাধু সিমলা বাজারে আসে, বেশ স্থূলকায় ব্যক্তি--গেরুয়া পরা। তিনি কাঁসারীপাড়া এবং আরও দু-এক জায়গায় খাবারের দোকান করেন। তিনি হিন্দুস্থানী ভাবে নানা খাবার তৈরী করিতেন এবং অপরকে বিক্রয় করিতে দিয়া রাস্তায় ফুটপাতে মৃগচর্ম পাতিয়া একতারা লইয়া ভজন করিতেন। এইজন্ম সকলে তাঁহার দোকানকে পরমহংসের দোকান বলিত। তিনি সিমলাতে নানাপ্রকার মিষ্টান্নের প্রচলন করিলেন। এখন অসংখ্য খাবারের দোকান এবং রকমও অসংখ্য।

পয়সার কথা

শৈশবে আমাদের বাঘ-মুখো পয়সা ছিল। অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পয়সা। মাঝে মাঝে সিক্কা পয়সা দেখিতে পাওয়া যাইত। সিক্কা পয়সা বাঘ-মুখের চেয়ে কিছু ছোট। তাহার পর বিবি-মুখো পয়সা "কুইন ভিক্টোরিয়া", পরে রাণী-মুখো পয়সা। তখন ডবল পয়সার প্রচলন ছিল। এখন কই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ডবল পয়সা ইংরাজী পেনীর সমান। তখনকার দিনে গুট্‌কে পয়সার প্রচলন ছিল।

কড়ির কথা

আমাদের শৈশবকালে যদিও পয়সার প্রচলন হইয়াছিল কিন্তু সাবেক হিসাবে কড়ির প্রথা বেশী পরিমাণ ছিল। স্থানে স্থানে ধুকুড়ি বা বোরা পেতে লোক বসিত। ধুকুড়ি বা বোরার উপর কড়ি রাখিত এবং যাহারা বাজার করিতে যাইত তাহারা একপয়সা দু-পয়সার কড়ি ভাঙ্গাইয়া লইত। শাক আনাজ তরকারী কড়ি দিয়া কেনা হ'ত। এমন কি উড়ের দোকানের জলপান পর্যন্ত। খাবারের দোকানে চলিত না। কবিওলার গান আছে "ধুকুড়ি পেতে বস্‌তিস

তখন, গুণতিস্ কড়ির পণ, এখন পাচ্ছিস্ থ্যাঙ্ক, বাড়ছে ব্যাঙ্ক, ট্যাঁকে ব্যাঙ্কের নোট" ইত্যাদি, "কড়ি দিয়ে কিনলুম দড়ি দিয়ে বাঁধলুম" ইত্যাদি। আমরাও ছেলেবেলায় কড়ি ভাঙ্গিয়ে জলপান কিনেছি এবং ঝি-চাকরও বাজার করেছে। যাহোক, এত হ'ল জিনিস কেনার কথা। কিন্তু বাড়ীতে তখন আলনা হ'ত অতি সুন্দর রকম। বেতের আয়তন করে তার উপর নতুন লাল সুতো দিয়ে কড়ির নানারকম কাজ করা হ'ত এবং দুপাশে কড়ির ঝোলা হ'ত। দেখিতে অতি সুন্দর হ'ত। তখন কাঠের বাক্স ছিল না, বেতের গোল গোল বা বাদামী রংয়ের পেঁটরা ছিল তাতে কড়ির নানারকম শিল্পকর্ম। ঘরে সাজাবার সিকে হ'ত। তাতে রঙিন হাঁড়ি ঝুলান হ'ত। যাহোক গৃহের দ্রব্যাদি সব কড়ির হ'ত। এমন কি মশারির দড়ি টাঙ্গাইবার বেলাতেও ঝালরের মত কড়ি থাকিত। তখন আর একরকম কাঠের সিন্দুক ছিল। তাতে চামড়া মুড়ে বড় বড় মাথাওয়ালা পেতলের ছোট ছোট পেরেক দিয়ে নানারকম ফুল ও নকসা করা, তাকে "ইচ্‌কতর" বলিত। আমরা ছেলেবেলার পুরানো ধরণের কড়ির আলনা দেখে বিরক্ত হতাম এবং ঘরে কেউ না থাকলে সেইসব কড়ি ছিঁড়ে নিয়ে খেলা করতাম। এইরকম করে সব আলনা নষ্ট হয়েছে। "ইচ্‌কতরের" পিতলের টোপগুলো খুলে নিয়ে নষ্ট করেছি, এইরকম করে অনেক পুরানো জিনিস সব নষ্ট করেছি। এখন বড় দুঃখ হয়। কাঠের বাক্স অনেক পরে হয়, এইজন্য ইংরাজি শব্দ ব্যবহার হয় বাক্স। অবশ্য বাসন রাখিবার জন্য কাঠের বড় বড় সিন্দুক ব্যবহার ছিল। এবং তাহার কব্জা কামারশালে ফরমাস দিতে হ'ত। সিন্দুকের আয়তনে কব্জা গড়াইতে হ'ত।

শরীরের আয়তন ও ভাত খাইবার পরিমাণ

তখনকার দিনের লোকের শরীরের আয়তন এখনকার লোক

হইতে অনেক বড় ছিল। এখন মাঝে মাঝে সেই আয়তনের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা খুব লম্বা চওড়া, হাত লম্বা লম্বা বলিষ্ঠ ও বুক চাটাল। আমার পিতামহোদয়ের আয়তন হিসাবে নরেন্দ্রনাথ খর্বাকৃতি ছিলেন, এইজন্য ন'ঠাকুরদাদা গোপাল দত্ত আদর করিয়া নরেন্দ্রনাথকে "বেঁটে হালা" বলিয়া ডাকিতেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের আয়তন অনুমান করা যায়। তখন মুগুর ভাঁজা ও ব্যায়ামের চর্চা ছিল। পাল্কি করিয়া যাওয়া অতি অল্প লোকের প্রথা ছিল। সাধারণ লোক হাঁটিয়া যাইত। চার-পাঁচ মাইল দূরে যাওয়া তাহাদের নিকট বিশেষ বলিয়া বোধ হইত না। এমনকি অনেকে হরিণাভি, রাজপুর হইতে হাঁটিয়া আসিয়া কলিকাতায় অফিসে কাজ করিতেন এবং বৈকালে হাঁটিয়া বাটী যাইতেন। তখনকার দিনে এইটাই প্রথা ছিল। সকলের গায়ে বিশেষ সামর্থ ছিল। সরিষার তেলটা সকলে প্রচুর মাখিত এবং পুকুর বা পাত-কুয়ায় স্নান করিত। সকালে আদা ছোলা ও মুগের ডাল ভেজা খাইত এবং অপরাহ্নে কিছু ফল খাইত।

তখনকার দিনে অধিকাংশ লোক ভাত খাইত। সহরে লোকেরা দিনে আড়াইপোয়া চালের ভাত, রাত্রে আধসের চাল ও তদোপযুক্ত তরকারী। অনেক লোকের বাড়ীতে গরু ছিল এইজন্য দুধটাও পাওয়া যাইত। না হইলে গয়লাদের বাড়ী হইতে দুধ আসিত, সেও সস্তা। দশ হইতে ষোল সের পর্যন্ত টাকায় ছিল। এইজন্য সকলেই কিছু কিছু দুধ পাইত। মাছ, আনাজ তরকারী এখনকার তুলনায় বহুল পরিমাণে সস্তা। সাধারণ লোকের এইজন্য বেশ খোরাক ছিল এবং লম্বা আকৃতি ছিল। গ্রামদেশ হইতে অর্থাৎ কলকাতার দক্ষিণ দেশ বা বর্দ্ধমান হইতে যখন আমাদের বাটীতে লোকজন আসিত তাহারা অধিক পরিমাণে আহার করিত। দুপুর-বেলা তিনপোয়া হইতে একসের চাউলের ভাত খাইত এবং রাত্রে

কিছু কম। আমরা আড়ালে তাদের রাক্ষুসে লোক বলিতাম। কারণ আমাদের আহার সতি ্য কম ছিল।

ম্যালেরিয়া প্রথম দেখা দিল

তখন বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া ছিল না। আমাদের শৈশবে প্রথম ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইল। বাংলাদেশ ছাইয়া ফেলিল। এই ম্যালেরিয়া জ্বর, কয়লার কারবার ও পাটের কারবার এই তিন কারণে কলিকাতায় এত বসতি হইল। ম্যালেরিয়ার ভয়ে সকলে আসিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইল। আমাব ছোট কাকা তারকনাথ দত্ত পরীক্ষাব জন্য অতিশয় অধ্যয়ন করিতেন এবং সর্বদা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হইতেন। অতিশয় পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর খারাপ হইলে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমানে পাঠান হইত। বর্দ্ধমান তখন খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। রেল-পথ খোলা হইলে চারিদিকে ম্যালেরিয়ার জ্বর উঠিল।

অষ্টবসুর পাড়া

শৈশবে আমরা কর্তাদের কাছে শুনিতাম যে সিমুলিয়া গ্রামে আট ঘর বোস বাস করিত। এইজন্য এই স্থানকে বিদ্রূপছলে অষ্টবসুর পাড়া বলিত। এই আট ঘর বোসেরা প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, খুব রোজগেরে এবং ইঁহাদের বাটীতে লোকজন খাওয়ান, পূজা প্রভৃতি হইত কিন্তু ইহারা সকলেই তন্ত্রের উপাসক ছিলেন। অপ্রসাদী 'কারণ' ইঁহারা খাইতেন না। বিশেষ দিনে পূজা করিয়া সকলেই সমবেত হইতেন, এবং মাটির গামলায় 'কারণ' ঢালিয়া তাহাতে জবা ফুল দিতেন এবং গোল হয়ে ঘুরে বসে সেই 'কারণের' মধ্যে নল দিয়া টানিতেন. ফুল যাহার দিকে ভাসিয়া যাইত তিনিই জয়ী হইতেন। সকলেই ছিলেন যেমন রোজগেরে, 'কারণে' তেমনি

আসক্ত ; তবে রাস্তায় চলাচলি করিতেন না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি সিমলেতে বড় মাতালের উৎপাত ছিল। এইজন্য সহরে এক প্রবাদ ছিল, 'সিমলার মাতাল আর বাগবাজারের গেঁজেল'।

ভিস্তি ও মশক

ছেলেবেলায় দেখিতাম ভিস্তিরা মশক করে জল নিয়ে বড় রাস্তায় দিত। জলটা হেদোর পুকুর থেকে লইত, সেটিও গরমি-কালে, অপর সময় নয় ; কিন্তু গলির ভিতর নয়। তখন গাড়ী করে নল দিয়ে জল দেওয়ার প্রথা ছিল না এবং লোহার বালতিও ছিল না। এইজন্য আস্তাবলে ও অন্যান্য স্থানে ভিস্তিওয়ালারা মশক করে জল ঢালিত। তারপর গাড়ী করে জল দেওয়া ও নল দিয়া জল দেওয়ার প্রথা উঠিল। এমন কি কাঁসারিপাড়ার সঙ বা অন্য কোন যাত্রাতে ভিস্তি সাজিয়া আসিয়া গান করিত।

চাকা চাকা সুপারী কাটা

তখনকার দিনে তত্ত্ব পাঠালে মশলা দেওয়ার একটা প্রথা ছিল। তাহাতে কাগজের মত পাতলা চাকা চাকা সুপারী দেওয়া হ'ত। বড় বাজারে এইরূপ সুপারী পাওয়া যাইত, অন্যত্র চাকা-সুপারী বা চিঁড়ে-সুপারী পাওয়া যাইত না। মশলার সহিত জায়ফল ও জয়িত্রী দেওয়া হইত। পোলাওতে ও পানেতে জয়িত্রী ও জায়ফল দেওয়ার প্রথা ছিল। এসবই আমাদের বাল্যকালের কথা। তাহার পর সহরে এমন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে এ-সকল সামান্য কথাও লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে।

মেয়েদের মাথা ঘসা

তখনকার দিনে সধবা স্ত্রীলোকদের কোন শুভকার্য হইলে বেসন বা অন্য কোন জিনিস দিয়া মাথা ঘসিত। জোড়াসাঁকোর মাথাঘসা

গলিতে সে-সব মশলা পাওয়া যাইত। তারপর নারিকেল তৈলের মশলা দিয়া একরকম গন্ধ করিত. সেই তেল মাথায় দিত। এটা পুরান প্রথা। আমরা এই গন্ধটা পছন্দ করিতাম না। আমাদের এই তেল মাখিতে হইলে আমরা কান্নাকাটি করিতাম। তাহার পর ডাক্তারখানা থেকে রঙীন শেকড় ও লেবুর তেল, নারিকেল তেলে মেশান হইত। এখন অনেক রকম তেল হইয়াছে। কিন্তু তেল-হলুদ সিঁদুর মাখা শুভকার্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তখনকার দিনে সাবানের প্রচলন ছিল না। শুভকার্যে তেল-হলুদ মাখা হইত। কিন্তু আমাদের সব ছোট ছেলেদের ময়দা, জাফরান এই রকম সব জিনিস দিয়ে একটি গোলা কোরে অনেকক্ষণ মলিত। সকালবেলা হইলে স্নান করাইয়া দিত এবং বৈকাল হইলে মুছাইয়া দিত। তাহাতে গায়ের চামড়া বেশ নরম ও মসৃন হইত। এটা মোগল বেগমদের প্রথা, ভদ্র বাঙালীদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। কারণ মোগল বেগমদের ভিতর এই জিনিসটি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক ছিল বেসন জলে বা দুধে গুলে মাখাইয়া দিত। তাহাতেও শরীর বেশ স্নিগ্ধ হইত। গরীবরা খোল মাখিত। আমাদের চাকরেরা খোল মাখিয়া স্নান করিত। অবশ্য বাবুরা ফুলেল তেল মাখিত। একজন মুসলমান, বাড়ীতে ফুলেল তেল, আতর, যোয়ানের আরক, মৌরীর আরক ও কেওড়া সারা বৎসর জোগাইত এবং পূজার সময় তাহার হিসাব হইত ও দাম পাইত। আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্ণৌ-এর একজন মুসলমান এই সব দিতেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে আসিলে সেই মুসলমান স্বামীজীকে বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আপনার পিতার চাকর। আপনি শৈশব হইতে আমার জিনিস ব্যবহার করিয়াছেন, আমার একটা উপায় করুন"। সেইসময় ভাগ্যক্রমে ক্ষেত্রীর রাজা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। স্বামীজী দয়াপরবশ হইয়া ক্ষেত্রীর রাজাকে এক চিঠি দেন—'এই ব্যক্তি আমার পিতার সময়কার লোক এবং শৈশব

হইতে অনেক আতর, ফুলেল তেল ও গোলাপ জল লইয়াছি'। সেই চিঠি দেখিয়া ক্ষেত্রীর মহারাজ পাঁচশত টাকার জিনিস লইয়াছিলেন। তখনকার দিনে এসব জিনিস নগদ কেনাবেচা হইত না। এত মনোহারী দোকানও ছিল না।

ছাতুবাবু ও রাজাদের দল

আমাদের শৈশবে দলাদলি লইয়া বড় ঘোঁট ছিল। সিমুলিয়া ও তন্নিকটস্থ লোকেরা ছাতুবাবুর দলভুক্ত এবং বাগবাজারের লোকেরা রাজা রাধাকান্ত দেবের দলভুক্ত। এক উচ্চ সভা করিয়া সকল স্থানের কুলীন ও মাননীয় লোকরা সমবেত হইয়া সকলে মালা ও চন্দন ছাতুবাবু ও রাধাকান্ত দেবকে পরাইয়া যান। এইজন্য ইঁহারা আপন আপন দলের গোষ্ঠিপতি হইয়াছিলেন এবং সকলের কাছে বিশেষ মান্য পাইতেন। যদি প্রাচীন গোষ্ঠিপতির খাতা থাকে তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে তখনকার দিনে কতজন ভদ্রলোক বাস করিত। ইহা ছিল কলিকতার এক রকম জনসংখ্যার হিসাব, অবশ্য সামান্যভাবে। উভয় দলেরই একটু আকৃচা-আকৃচি ছিল এবং কবিওয়ালা ও ছড়াওয়ালারাও পরস্পর এই আকৃচা-আকৃচি ভাব রাখিত। এখন কলিকাতায় নবাগত লোকসংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে কৌতূহলের নিমিত্ত সেই খাতা দেখিতে ইচ্ছা হয়। এতে তখনকার কলকাতার আর এখনকার কলকাতার প্রভেদটা বুঝা যায়।

আমাদের বংশে বলি নাই

আমরা যদিও শাক্ত বংশ কিন্তু আমাদের বংশে বলির প্রথা নাই। এমন কি মানস করিয়াও কালীঘাটে বলি দেওয়ার প্রথা ছিল না। বলি কোন প্রকারেরই ছিল না। কুমড়া বলি, আখ বলি পর্যন্তও নয়। এটা কি কারণে হইয়াছিল বুঝা যায় না। আমাদের

শাক্ত বংশে বলি নাই, আমার মাতামহ রামতনু বসুরাও শাক্ত কিন্তু তাহাদের বলি আছে। পূর্বে আমাদের ঠাকুরঘরে রামনবমীর একটা বিশেষ নৈবেদ্য দেওয়া হইত এই পর্যন্ত জানি। কলিকাতার অনেক প্রাচীন বংশে বলি প্রথা ছিল না। বিশেষ বিশেষ বংশের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নেই।

তামাক খাওয়ার কথা

আমরা ছেলেবেলায় দেখিতাম যে সকালবেলায় বাটীতে যত লোক আসিত উনান থেকে কাঠকয়লার আগুন আনিয়া দা-কাটা তামাক দিয়া কলকে সাজিত। দুপুরবেলা একটা গামলা করিয়া কাঠ কয়লার আগুন আনা হইত, মোটা বাঁশের চোঙে তামাক, একটা চিমটা ও গামলায় জল থাকিত। চাকরেরা খাইয়া শুইলে যত পাড়ার বৃদ্ধরা আসিয়া মজলিস করিত, তামাক সাজিত ও হাত ধুইত। এখনকার খামিরা তামাক তখন দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন অম্বরী তামাক ছিল। বিশেষ বড় মানুষ অম্বরী তামাক ব্যবহার করিত দা-কাটা তামাক সাধারণের চলিত। সভা বা মজলিস হইলে, কড়ি-বাঁধা হুঁকা ব্রাহ্মণের হইত এবং অপরের সাধারণ হুঁকা হইত। অধিকাংশ হুঁকা রূপো বাঁধান হইত এবং বৈঠকে বসান থাকিত আর একটি রেকাবিতে কলাপাতা থাকিত। যে যার নিজের নল করিত। এখন কলাপাতার নল কি ও কি করিয়া তাহা করিতে হয় তাহাও অনেকে জানে না।

চকমকি গন্ধকের কাঠি

আগে দেশলাই ছিল না চকমকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করিয়া শোলা ধরাইতে হইত এবং একরকম গন্ধকের কাঠি ছিল। জ্বলা শোলাতে সেই গন্ধকের কাঠি ঠেকালে জ্বলিয়া উঠিত। তাহার পর দেশলাই উঠিল। তাহার মুখ সাদা, দেওয়ালে ঘাষলে আগুন

জ্বলিত। অনেক ছোট ছেলে ইস্কুলে যাইবার সময় তামাসাচ্ছলে নিজের ইজেরে ঘষিয়া দিত তাহাতে আগুন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইত। ছেলেবেলায় তাই আমাদের হাতে দেশলাই দিত না। এখন অনেকে গন্ধকের কাঠি ও চক্‌মকির কথা শুনিলে হাসিবে।

আলো ও মাটির প্রদীপ

রাস্তায় তখন দূরে দূরে একটা ক'রে থামেতে রেড়ির তেলের আলো জ্বলিত। পেটমোটা ডাণ্ডাওয়ালা একরকম টিনের তেলপাত্র ছিল তাহাতে রেড়ীর তেল দিয়া আলো দিত আলো অনেক দূরে দূরে হইত। গলির ভিতর সর্বত্র আলোর বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না, কোন কোন গলিতে একটা করিয়া আলো থাকিত। ছোটলোক ও দুষ্টলোকেরা রাত্রিতে কাঠের আলোর থামে উঠিয়া তেলপাত্র হইতে রেড়ীর তেল ঢালিয়া চুরি করিয়া পলায়ন করিত। সকালবেলা বাতিওয়ালা উড়ে আসিয়া বকাবকি করিত। এটা অনেক সময় হইত। রাত্রে নিমন্ত্রণ বা অন্য পাড়ায় যাইতে হইলে যে-যার নিজের নিজের লণ্ঠন লইয়া যাইতে হইত। বড় মানুষ হইলে চাকরে লণ্ঠন ধরিত এবং গরীব হইলে নিজেই লইয়া যাইত। এ না হইলে রাত্রে রাস্তায় ভয়ের কারণ ছিল। এখন যেসব রাস্তা বা গলি দেখা যায় আগে সেসব পগার বা নালা ছিল। আশেপাশের বাটীর নোংরা জল ও ময়লা তাহাতে গিয়া পড়িত এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ধুইয়া অন্য অন্য দিকে চলিয়া যাইত। যাহাদের একটু বড় রাস্তায় বাটী, উভয় পার্শ্বে সরকারী নালা ছিল এবং বাটীতে উঠিবার জন্য নিজের নিজের সাঁকো ছিল বা একটা খিলান ছিল ও তাহার উপর ধাপ। এইরূপ অনেক বাটীর উপর ছিল। এখন সেসব মাটির নীচে চাপা আছে, যখন খোঁড়ে মাঝে মাঝে বেরোয়।

মাটির প্রদীপ পিতলের পিলসুজের উপর থাকিত। তাহাতে

রেড়ির তেল দিয়া নেকড়ার সলতে হ'ত। এই সলিতা পায়ের উপর রাখিয়া করিতে হইত। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি একটি ডাক্তার ছেলেকে পিলসুজের সলিতা পাকাইতে বলিয়াছিলাম, সে তো নানান রকম মোড় দিয়া দড়ি পাকাইতে সুরু করিল। আমি রাগিয়া তাহাকে ধমকাইয়া কিরকম করিয়া সলিতা পাকাইতে হয় দেখাইয়া দিলাম। সে রাগিয়া বলিল, "আপনারা তো প্রদীপে পড়া লোক, আমরা গ্যাসবাতি, ও হ্যারিকেনে পড়ি, আমাদের সলিতার কি দরকার"; শুনিয়া আমি তো খুব হাসিতে লাগিলাম।

চা-খাওয়া ও কালো কেট্‌লি

আমরা যখন খুব শিশু তখন একরকম জিনিস শোনা গেল—চা। সেটা নিরেট কি পাতলা কখনও দেখা হয়নি। আমাদের বাড়ীতে তখন আমার কাকীর প্রসব হইলে তাঁহাকে একদিন ঔষধ হিসাবে চা খাওয়ান হইল। আমরা তখন ছোটছেলে ন্যাংটো, ঘিরে রইলাম, একটা কালো মিনসে (কালো কেটলী) মুখে একটা নল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর কুচো পাতার মতন কি দিলে, গরম জল দিলে, তারপর ঢাললে, একটু দুধ চিনি দিয়ে খেলে। আমরা তো দেখে আশ্চর্য, যা হোক্ দেখা গেল, কিন্তু আস্বাদনটা তখনও জানিনি। আর লোকের কাছে গল্প যে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, এই হ'ল প্রথম দর্শন। তখন চীন থেকে চা আসত, ভারতবর্ষে তখন চা হয়নি।

আপেল ও বরফ

কলিকাতার লালদিঘীর ধারে বরফের গুদাম ছিল। কানাডা থেকে মাল লইবার জন্য খালি জাহাজ আসিত। সেই জাহাজে ভারসাম্য (Balance blast) রাখিবার জন্য চাপ চাপ বরফ আসিত,

কতকটা গলিয়া যাইত। কিন্তু তবুও অনেক কলিকাতায় পেঁছাইত। গরমিকালে ছোটকাকা কাছারী হইতে আসিবার সময় কখনও কখনও ঘোড়ার কম্বলে মুড়ে বরফ আনিতেন, সেই বরফ করাতের গুঁড়া দিয়া রাখিতে হইত। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু তাঁহারা খাইতেন না। আমাদের বাটীতে বিধবারা খাইতেন না। আমরা লুকিয়ে একটু আধটু খাইতাম। তাই জাতটা অত শীঘ্র যায় নাই।

লোকের মুখে শোনা গেল আপেল বলে একটা জিনিস আছে। সেটা সাহেবরা খায় তাই ওদের অত বুদ্ধি, কিন্তু বহুদিন তাহার দর্শন পাই নাই। অবশেষে শোনা গেল যে বরফের ভিতর কোরে এক রকম ফল আসে, টাকায় তিনটি বা চারটি। একবার এক টাকায় চারটি আপেল আনিয়া আমরা সব ভাই বোনে একটু একটু মুখে দিলাম। পাতলা পাতলা এক চাকা করিয়া ভাগে পড়িল, কিন্তু এর বিশেষত্ব কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এখন আপেল নাসপাতি বারমাস পাওয়া যায়। তখন ইহা অতি আশ্চর্য জিনিস ছিল।

নারিকেল কুল

এখন যাহাকে নারিকেল কুল বলি তখন উহাকে বোম্বাই কুল বলিতাম। ধর্মতলার বাজারে কিছু কিছু পাওয়া যাইত। তখন ইহা খুব বড় মানুষির খাওয়া ছিল। ঠাকুর দেবতার নৈবেদ্যে দেওয়ার প্রচলন ছিল না। বোধ হইতেছে তখন এর সবে শুরু হইয়াছে।

টিকে

যখন সুঁদুরীকাঠের জ্বালের প্রথা উঠিয়া গেল এবং পাথুরে কয়লার প্রচলন হইল ঠিক সেই মাঝ বরাবর সময়ে লোকের তামাক খাইবার বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মানুষের এমন বুদ্ধি যে মাণিকতলার

মুসলমানরা কাঠকয়লা গুঁড়িয়ে চাকতি চাকতি করে এক প্রকার জিনিস বাহির করিল। প্রথমে লোকে তাহা দেখিয়া কালবাতাসা নাম দিল এবং মুসলমানের হাতের জল বা ফ্যান আছে বলিয়া যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু তাঁহারা ছুঁইতেন না। কিছুদিন এ একটা বড় সমস্যা হইল যে মুসলমানদের জল ছোঁয়া যাইতে পারে কি না? কিন্তু এমন আবশ্যকীয় জিনিস যে ক্রমে ক্রমে তাহা চলিয়া গেল, গোঁড়াদের আপত্তি চলিল না। মেদিনীপুর হইতে আমাদের চাকরেরা আসিয়া খানকতক কালবাতাসা দেশে দেখাইতে লইয়া গেল, যে কলিকাতায় অদ্ভুত জিনিস হইয়াছে। টিকা ও দেশলাই, ১৮৭২ বা ১৮৭৩-তে প্রথম উঠে।

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা

এখন যেটা সিমলাতে মহেন্দ্র গোস্বামীর গলি, ওটা পূর্বে একটা পগার ছিল। মাঝে মাঝে সাঁকো ছিল। যে যার বাটী সেইভাবে যাইত। লম্বা টানা রাস্তা সেরূপ ছিল না। সাঁকোটা পাকা ছিল, আশেপাশের পগারের জল এই বড় পগার দিয়ে চলে যেত এবং খানিকটা যাইয়া দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড একটা পুকুর ছিল এবং পুকুরের পাড়ে গয়লাদের বসতি ছিল। পুকুরের দক্ষিণদিকে একটা বাঁধান ঘাট ছিল। ইহাকে আমরা গয়লা পুকুর বলিতাম। এখন পুকুর ভরাট হইয়া মাঠ হইয়াছে, তাহাতে বাড়ী হইয়াছে। পূর্বের কোন স্মৃতি পর্যন্ত নেই। রামতনু বসুর গলি ইত্যাদি স্থানকে সাধারণতঃ আমরা গয়লা পাড়া বলিতাম। মধু রায়ের গলি দিয়া যাইয়া ডান ধারে খোলা যায়গায় বাঁদিকে গয়লাদের একটা বিখ্যাত হদ্‌দো ছিল। গরুর চোনা ও গোবর সেই হদ্‌দোতে পড়িত, চলাচলের জন্য ওর উপর দুখানা কাঠ ছিল। আমরা কখনও কখনও মার সঙ্গে পাল্কি ক'রে সেই কাঠের উপর দিয়া হ্রদ পার হ'য়ে ডাঙ্গায়

পৌঁছিতাম পাল্কির ভিতরকার বেতের ছাউনির ভিতর দিয়া মুখ নিচু করে দেখতাম, আর ভাবতাম, যদি বেহারাদের পা ফস্কে যায় তো একেবারে হ্রদেতে হাবুডুবু। যখন হেঁটে যেতাম তখন কোন বড় লোক হাত ধরিত, আমরা চোখ বুজিয়ে সেটা পার হতাম, বড় ভয় হ'ত।

যা হোক গয়লারা একবার বারোয়ারী করে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা দিলে। খুব বড় বাঁশের মাচা করলে এবং বাঁশের খুঁটিতে উঁচু কোরে বাঁশ দিয়ে ঝাড় লণ্ঠন, বেল লণ্ঠন ইত্যাদি অনেক ঝোলালে. সভা বেশ ভাল করে সাজালে এবং পাড়ার ভদ্রলোকদের সব নিমন্ত্রণ করলে। খুঁটির গায়ে এড়ো লম্বা লম্বা বাঁশ থেকে ঘেরা-টোপ দেওয়া অনেক পাখীর খাঁচা ঝুলিয়ে দিলে। তখনকার দিনে অনেক ভদ্রলোকদের পাখী ছিল। আমার মাতামহদের পাখীর বাতিক বেশী ছিল। নানা রকমের পাখী, পায়রা, রাজহাঁস ইত্যাদি অনেক প্রকারের ছিল। বাতিক এত বেশী ছিল যে এক সরিক নিজের বাটী বাঁধা দিয়ে পাখীর ব্যবসা করতে লাগিল। ভোর হইতেই যাত্রাদলের ভিতর থেকে একজন হরবোলা হুবহু এক এক পাখীর আওয়াজ করিতে লাগিল এবং খাঁচার ভিতর হইতে একে একে পাখীরা আওয়াজ করিতে লাগিল। এইরূপে সে সকল পাখীর আওয়াজ করিল এবং সকল পাখী তাহার প্রতিধ্বনি করিল। তখন ঝাড় লণ্ঠন নিবাইবার সময় হইয়াছে।

যাত্রা ছিল "রাধিকার মানভঞ্জন"। আমরা দুভাই—বাবুদের বাড়ির ছেলে, ঘুমচোখে ঢুলতে ঢুলতে উপস্থিত হইলাম। গয়লারা সকলেই আমাদের চিনিত। অতি যত্ন করিয়া আসরের মাঝখানে বসাইল। আমাদের সেজন্য দেখিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ফর্সা হইতেই বুড়ো গোবিন্দ অধিকারী—দাঁত পড়ে গেছে, গায়ের মাংস ঝুলে গেছে, ঈষৎ গৌরবর্ণ, বেশ লম্বা চওড়া—এসে

দাঁড়াল। কিন্তু বয়স তখন বেশী হয়েছিল, সেকেলে যাত্রাওয়ালার কাপড় পরে এসে দাঁড়াল, অর্থাৎ বুকে-পিঠে জড়ান গেঁট দেওয়া, হাত বার করা পিরাণ আর মাথায় পরচুলা। এই সেজে তো বেরুল। গোবিন্দ অধিকারী আসরে এসেছে এই তো একটা হৈ-চৈ পড়িল। এইজন্য বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। পালা গাওয়া সুরু হইল। একজন এসে বলল, "বৃন্দাবনসে দূতী আয়া"। অমনি গোবিন্দ অধিকারী উত্তর দিল "কেয়া বিলাতসে ধুতি আয়া" বোধ হইতেছে এই সময়ে প্রথম বিলাতী কাপড় উঠিয়াছে। বছরটা হচ্ছে ১৮৭১ আন্দাজ। এই রকম ভাবে কথা চলিতে লাগিল এবং সকলে খুব হাসিতে লাগিল। তাহার পর রাধিকা সেজে একজন বেরুল। সে ছড়া কাটতে লাগল, "কাল মুখ আর দেখব না, কাল জল আর খাব না, কাল চুল আর বাঁধব না," ইত্যাদি কাল শব্দ দিয়া অনেকক্ষণ ছড়া চলিল। মাঝে কেলুয়া ভুলুয়া নামে দুটো সঙ এল। তারা নাচন-কাঁদন ও ছড়া কাটিয়া গেল। আর একটা মুনি গোঁসাইজী এল, পাটের সাদা দাড়ি, সাদা চুল, সেও কি বলে গেল। তারপর একটু বেলা হ'লে একজন নাচতে শুরু করলে। সে আসরের জাজিমের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বাজনার তালে তালে শুয়ে শুয়ে নানা প্রকার নাচতে লাগল। এই রকম অনেকক্ষণ নাচিবার পর মাথাটা আর পায়ের চেটো মাটিতে রেখে মেরুদণ্ড ধনুকের মত করে দু'পায়ের ঘুমুরের সাহিত নানা প্রকার সুরে ঘুরে ঘুরে বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। অতি সুন্দর সেটা হয়েছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে নাচের পর পেটের উপর একটা ছোট ছেলেকে দাঁড় করিয়ে নিলে। এই ছেলেটাকে পেটের উপর দাঁড় করিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। সকলেই মোহিত হয়ে গেল। এইরূপ ভাবের নাচ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর ঝুমুর

পায়ে দিয়ে পা ঠুকে ঠুকে কেলুয়া ভুলুয়া নাচিতে লাগিল আর গাহিতে লাগল, "তোমার যম এসেছে নিতে, তুমি দেরী কোরো না যেতে"। আমরা দু-ভাই ছোটছেলে বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময় ফিরিয়া আসিলাম। তখনও যাত্রার খোঁয়াটা মাথায় ঘুরছে: নরেন্দ্রনাথ বাটীতে আসিয়াই ছাদে নাচ শুরু করলে। গোবিন্দ অধিকারীর পালা থেকে আরম্ভ করে যে ক'টা পালা মনে এল সব গাইল তারপর ছোট বোনেরা কথা শোনেনি তাই রাগ করে ছাতে পা ঠুকে তাদের উদ্দেশ্য করে বললে,—তোমায় যম—ইত্যাদি। আর এক গান শুরু করলে, "রাই ধৈর্যং, রহু ধৈর্যং, গচ্ছং মথুরায়ে, যদি না যাবে তোমায় ঝুঁটি ধরে নিয়ে যাব"। দুই ছোট বোনের সঙ্গে ঝগড়া হ'লে এই নাচ আর গান হ'ত। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার এই পর্যন্ত মনে আছে।

কেষ্ট যাত্রা

ছেলেবেলায় এক বদ্‌খদ্‌ জিনিস ছিল কেষ্টযাত্রা। কেলে কেলে রোগা রোগা ছোঁড়া কোন দেশের বলতে পারি না, সব যাত্রাদলে হ'ত। রাত্রি দেড়টা দুটো থেকে যাত্রা শুরু হ'ত। লোকে ঘুমে ঢুলত। সেই জন্য তাহারা মন্দিরা ও খরতাল বাজাইত। সেই আওয়াজে ঘুমবাবাজি দেশ ছেড়ে পলাইত। তখন কি'ন হারমোনিয়াম ছিল। আর কি এক চ্যাঁচাত—"এস হে, কেষ্ট হে"। তাদের কোপনী মারা গোছ কাপড় পরা, পিঠে একটা ন্যাকড়া ঝোলান গলার কাছে গেঁট বাঁধা, মাথায় পরচুলা, আর যো সো করে কতকগুলো ময়ুরের পালক গোঁজা। গায়ে খড়িমাখা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, আর দু'গালেতেও এই সাজসজ্জা। নাকী-সুরে সব চেঁচাত—"বাঁপরে কেঁষ্টরে"। এইত পালা গাওয়া হ'ত। মাঝে মাঝে কেলুয়া ভুলুয়া এসে খানিকক্ষণ ভাঁড়ামো করত।

আর মেঝেতে বসে কতকগুলো লোক একসুরে চেঁচিয়ে গান করত। সে একরকম সহ্য হ'ত। কিন্তু যারা বসে গাইত তার ভিতর থেকে একটা লোক বিকট আওয়াজ করে গানের মাত্রা নিয়ে চেঁচাত। আসল গান পড়ে রইল আর তার চিৎকার আরম্ভ হ'ল। এটা এমন ছোঁয়াচে ছিল যে একজনে ছাড়ে তো আর একজন ধরে; কান ঝালাপালা। আমি মাঝে মাঝে গালাগাল দিয়ে উঠতাম। এটা হচ্ছে গিটকারী, কানে একটা হাত দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ উলটে গিটকারী মারত। আমার মাঝে মাঝে মনে হ'ত সর্দারকে গিয়ে বলি, "বাবু, চিল্লোনিটা বাদ দাও না কেন"? খানিক বসে আমি উঠে আসতাম। আর নরেন্দ্রনাথ তো ভেঙচী কাটবার সর্দার। সে বাড়ী এসেই তার ইয়ারদের ডাকত—বাঁপরে কেঁষ্টরে! কিন্তু সকাল হইলেই গান থামত এই যা রেহাই। কেষ্ট যাত্রা শোনা আর শাস্তি ভোগা একই কথা।

নোকো (লক্ষণ) ধোপার যাত্রা

আমাদের বাড়ীর পাশে রায়দের বাটীতে প্রতিবৎসর বারোয়ারী রক্ষাকালী পূজা হইত এবং সেই উপলক্ষে যাত্রা হইত। আমাদের বাটী থেকে চাঁদার অংশ বেশী উঠিত। তাই একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। একবার নোকো ধোপার যাত্রা হইল—"কমলে কামিনী" বা "চণ্ডির মশান" এইরূপ একটা পালা হইল।
ভোর হইতেই নোকো বেরুল কাল রংয়ের চোগা চাপকান প'রে, মাথায় পাগড়ি, লোকটা দোহারা, শ্যামবর্ণ বা ঈষৎ ময়লা রঙ। বেশ লম্বা চওড়া, গলা বেশ সাধা ও মিঠে। গান ধরিল, "বিপদ সময় হও না সদয় ডেকে মরি শ্যামা শ্রীপদ নলিনী" অর্থাৎ শ্রীমন্ত, মশানের গান বা ঐ-ভাবের গান ধরিল। এই শুনে লোকে কেঁদে আকুল। আরও দু'খানা গান গাইলে। যাত্রার যা পালা সেতো মামুলী, সে

বিষয়ে আর বিশেষ লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না। আর সে সব অংশগুলি তত ভাল লাগেনি।

অপর সকল যাত্রা

তখন রামের রাজ্য অভিষেক বা বনবাস এই সকল যাত্রা চলিত এক যাত্রাতে কৌশল্যা গেয়েছিল' "ওরে রামশশী তুই নাকি হ'বি বনবাসী, কে ডাকিবে আমায় মা ব'লে"। নরেন্দ্রনাথ তো যাত্রা শুনে এসে পায়লা শুরু করলে হাত নেড়ে, চোখ উলটে, জিভ লম্বা করে ভেঙচুতে শুরু করলে—মা—ব—লে।।

অন্য যাত্রাতে সকালবেলা একটা লোক এসে ছড়া কাটত। তার বিশেষত্ব ছিল কোন্ কোন্ মাছ কি কি মশলা দিয়ে রাঁধতে হয়, প্রচলিত যত রকমের মাছ আছে সব মাছের রন্ধন-প্রণালী ছড়াতে সে আউড়ে যেত। কোন কোন যাত্রাদলে একজন লোক থাকিত, যে ফলারের ছড়া কাটিত। কোন্ কোন্ মাসে কি কি জিনিস দিয়ে ফলার হ'তে পারে—এইসব লম্বা ছড়া। এই ছড়া দুটো বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি রচনা করেছিল এবং অতি সুন্দর জিনিস হয়েছিল। এসব ছড়া যদি কাহারও মনে থাকে তো লিপিবদ্ধ করা উচিত, কারণ সাবেক কালের বাংলাদেশের সমস্ত রন্ধন-প্রণালী এতে আছে। আমি শুনিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমার স্মরণ নাই।

কোন কোন দলে অপর ছড়া গাইত। যথা লুচি, মণ্ডা, খাজা, গজা ইত্যাদি বিষয়ে। বাংলাদেশে কি কি মিষ্টান্ন ছিল তাহার একটা সমগ্র বর্ণনা। রসগোল্লা বা আধুনিক নানা রকম মিষ্টান্নের তাহাতে উল্লেখ নাই, সাবেক মিষ্টান্নের উল্লেখ আছে। এই সবের এখন বড় আবশ্যক আছে, বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ-ভাবে ইহাতে আছে।

অপর যাত্রা—দক্ষযজ্ঞের পালা হইত। তাহার একটি গান

এখনও মনে আছে। "যেও না যেও না সতীর ভবনে, ভূতগণ দেবে বিষম তাড়া"। দক্ষযজ্ঞের পালা খুব নামজাদা ছিল. এবং এতে অনেক ভক্তিপূর্ণ গান ছিল। সাধারণ লোকে এ পালা পছন্দ করিত। অন্য এক রকম যাত্রা ছিল। সেখানে গঙ্গাতে আর কালীতে ঝগড়া করে ছড়া কাটত। কালী বলছে, "শোন্ গঙ্গা তোরে কই, তোর মত আমি নই। গলিত কুষ্ঠের মড়া, ভাসিছে জোড়া জোড়া ইত্যাদি। গঙ্গা বলছে, "শিব আমাকে এত ভালবাসে যে মাথায় রাখে। তোকে তো কাপড় দেয় না, ভয়ে শ্মশানে লুকিয়ে থাকিস। গায়ে গহনা নাই, মড়ার মাথা গলার মালা. কাপড় দেয় না বলে মড়ার হাত পরিস, বাটীতে থাকতে দেয় না শ্মশানে মশানে থাকিস। তোর তো ভারি পতিভক্তি স্বামীর বুকে দাঁড়িয়ে রইছিস্"। এইরূপে শ্লেষপূর্ণ ছড়া কাটান হ'ত তার দুটো মনে আছে। এ সব বেশ ছিল. এটা প্রাচীন হলেও একটা জীবন্ত শক্তি ছিল। বাংলাদেশের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক এ সব ছড়া রচনা করেছিল।

আর একটা চেলা এসে গাইলে, "ষড়ানন ভাই রে তোর কেন নবাবী এত, তোর মা জগদম্বা পেটের দায়ে ছাগল খায়। তোর পায়ে লপেটা জুতা, তোর বাপ পথে মেঙ্গে খায়"। আর একটা প্রাচীন গানের একটু অংশ মনে আছে- "পতি যার ব্রহ্মচারী, জটাধারী, তার কি এ বেশ সাজে"? দুর্গা প্রতিমাকে সম্বোধন করে এটা বলা হ'ত। সবটা মনে নেই। কিন্তু প্রত্যেক যাত্রাতেই কেলুয়া ভুলুয়া আসিত আর অধিকাংশ যাত্রাতেই মুনী গোঁসাই আসিত।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা

তখনকার দিনে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বড় লোকপ্রিয় ছিল। তাহার ভিতর মালিনীর পালা খুব ভাল গাওয়া হইত। মালিনী আসিয়া

গাহিত, "ঐ দেখা যায় আমার বাড়ী চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা" ইত্যাদি। কোটাল গাহিত, "আর কি আমাদের আনন্দের সীমা আছে? এবার চোর ধরতে পেরে সবার মনে ভয় ঘুচেছে"। প্রচলিত কথায় বলিত 'কালা পেড়ে ধুতি আর বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি' কখনও পুরান হয় না।

মেয়ে-পাঁচালী

তখনকার দিনে মেয়েদের কার্য উপলক্ষ্যে মেয়ে-পাঁচালীর প্রথা ছিল অর্থাৎ মেয়ে-যাত্রার দল। তারা নিজেরাই সাজিত আর ভাঁড়ের পালা করিত। ছেলেবেলায় আমি দক্ষযজ্ঞ বা পার্বতীর বিবাহ এইসব পালা শুনিয়াছি। ভাঁড় যে সাজিত, সে আসিয়া বলিত, "এক কেঁড়ে এঁড়ে গরুর দুধ, এক মালা চাঁদের আলো এই সব উপকরণ বাটিয়া খাইলে আশু পীড়া সারিবে" ইত্যাদি। তাহারা তানপুরা, বেহালা বাজাইতে পারিত না। মন্দিরা, হাততালি ও বাঁয়াতবলা, এই কটাতেই কাজ সারিত ও সকলে একসঙ্গে গান করিত। কিন্তু মেয়ে-পাঁচালী বেশীদিন চলিল না। শিক্ষিত লোকেরা নিন্দা করিতে লাগিল ও উঠিয়া গেল।

ঝুমুরওয়ালী

বাংলার অপর জায়গায় এ-প্রথা ছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু কলিকাতায় তখনকার দিনে ঝুমুরওয়ালী ছিল। তাহারা ছোটলোক, কেলে কেলে মাগী, কাছ দিয়ে চলে গেলে একটা দুর্গন্ধ ছাড়িত, তাহারা পায়ে ঝুমুর দিয়া গাহিত। তখনকার দিনে বিবাহেতে গরুরগাড়ীতে কাগজের ময়ুরপাখী করে তার উপর ঝুমুরওয়ালীর নাচ দিত। ঝুমুরওয়ালীরা সেই ময়ুরপঙ্খীর উপর নাচিত আর পিছনে একটা লোক ঢোল কাঁসি বাজাইত। তাদের গানের একটা

উদাহরণ দিচ্ছি সেটা কালীর বর্ণনা, "মাগী মিনসেকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে বুকে দিয়েছে পা, আর চোখটা করে জুলুর জুলুর মুখে নেইকো রা"। তাহাদের ভাষা অতি গ্রাম্য কিন্তু কাহারও কাহারও ভিতর বেশ কবিত্ব ছিল। কিন্তু গানের মাথামুণ্ড বিশেষত্ব ছিল না, তারস্বরে বলিত "আরে রে"। পরে এই ঝুমুরওয়ালী অতি নিন্দার কথা হইল। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া হ'লে দুষ্টলোক একটা ঝুমুর-ওয়ালীকে তার দোরে বসিয়ে দিত, ঝুমুরওয়ালী অতি অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিত। স্ত্রীলোক বলিয়া তাদের কেউ মারিতে পারিত না। আর পুলিশের তেমন বন্দোবস্ত ছিল না। শেষে তাহাকে কিছু বকশিস দিয়া তাড়াইতে হইত। এইজন্য পরস্পরে ঝগড়া হইলে বলা হ'ত যে তোর দোরে ঝুমুরওয়ালী বসাব।

কাদামাটির গান

তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করিয়া গায়ে রক্ত, কাদা মাখিয়া মোষের মুণ্ড মাথায় লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হইত। আর বৃদ্ধ পিতামহ তাহার সমবয়স্কলোক, পুত্র, পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান করিত। সে সব অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য গান। বাড়ীর মেয়েদের সম্মুখেও সেই সব গাওয়া হইত এবং পাছে ভুল হয় এজন্য হাতে লেখা খাতা রেখে দিয়েছে, ইহাকে অপর কথায় খেউড় গান বলিত। তখনকার দিনে এ সবের প্রচলন ছিল এবং লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা ও কেশব সেন মহাশয়ের অভ্যুদয় হইতে ধীরে ধীরে এ সব উঠিয়া যায়।

তরজা

তখনকার দিনে তরজার খুব প্রচলন ছিল। এখনও আছে তবে অতি অল্প পরিমাণে। তরজাওয়ালারা রাগিয়া গেলে অশ্লীল ভাষায়

গান করিত, না হইলে অতি ভক্তিভাবে গান করিত। অনেক জায়গায় বেশ সুন্দর ভাব থাকিত। ছন্দটা প্রায় চোদ্দ অক্ষরের পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী থাকিত। সময়মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিত না। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, "আমার নামটি কীর্তি, তরজা বৃত্তি, হাতীবাগানে বাড়ী। কখনও বেচি নারিকেল তেল, কখনও তরজায় লড়ি তুলি বাজারে বাজা।"

এই তরজাওয়ালাদের চলিত পুরাণ বিশেষভাবে জানা থাকিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী চাপান দিলে অর্থাৎ প্রশ্ন করিলে আসরে উপস্থিত পণ্ডিতদের নিকটে কোন পুরাণে কি আছে তখনি জবাব করিত। তরজা মানে গালমন্দ এটা সব সময় নয়; সেটা পরস্পর রাগিয়া যাইলে করিত। লাহোরে এইরূপ তরজা দেখিয়াছি। রোমে এইরূপ তরজার প্রচলন ছিল। জুলিয়াস সিজারের যখন জয়ন্তী উৎসব হইয়াছিল তখন এক সিরিয়ান গোলামকে এম্পিথিয়েটারে আনিল তাহার দোহার কেহ ছিল না। অবশেষে এক বৃদ্ধ Knight-কে তরজা লড়িতে আদেশ করিল। বুড়া তরজা গাহিল। Casius জুলিয়াস সিজারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গাহিতে লাগিল।

'The Gods themselves can't gainsay his might. How can I a man think to gainsay it? So that albeit I liked him twice thirty years' free from all stains of blame, at morn I rose, a Roman knight and shall return home—a sorry prayer".

তার অল্প পরে আবার শুরু করে "Needst must he fear whom everybody fears" অর্থাৎ কেসিয়াস, জুলিয়াসের যে অপঘাত মৃত্যু হবে তাহা সে পূর্ব হইতেই বলিয়াছে।

তরজাগানের চেয়ে কবিওয়ালাদের গান পাণ্ডিত্য পূর্ণ ছিল ও তার তাল, রাগ বেশ ছিল। কেষ্ট বন্দ্যো। যখন প্রথম খৃষ্টান হন

কবিওয়ালা ঈশ্বর গুপ্ত তখন গাহিয়াছিলেন, "লাল ছাতি হাতে, সাদা ধুতি পরে, কেষ্ট বন্দ্যো কাশী যায়, কেষ্ট বন্দ্যোর পিসি তাড়াতাড়ি আসি বলে, ওরে বাবা কোথা যাস।"

"এক বলেরে জোটে বুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন, কেষ্ট বন্দ্যোর গীর্জা দেখে বলে এই কি গিরি গোবর্দ্ধন।" মোট কথা কবি-ওয়ালারা পণ্ডিত আর তরজাওয়ালারা অশিক্ষিত সাধারণ লোক কিন্তু তাদের কবিত্বশক্তি আছে।

বাচের গান

আমরা যখন খুব ছোটছেলে তখন গঙ্গায় বাচখেলা উঠিল এবং দাঁড় ফেলিবার তালে তালে সুর মিলিয়ে গান করা। অবশ্য সেটা অল্পদিন চলেছিল। "নতুন কাণ্ডারী হরি, ঢেউ দিও না গায়; সব গোপীকে পার করতে নেব আনা আনা, শ্রীরাধাকে পার করতে নেব কানের সোনা" এই সব গান চলিত। পূর্ববঙ্গের মাঝিরা মাঝে মাঝে এই সুরে নৌকা বাহিয়া গান করিয়া যায়। ওরা গাঙ হইতে গভীর রাত্রে শুনতে বড় মিষ্টি লাগে। পূর্ববঙ্গে ইহাকে সারি গান বলে।

হাফ আখড়াই

"হাফ আখড়াই" খুব ওস্তাদী ধরণের গান। এ ধরনের গানেতে উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব চলিত। বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে একত্রিত হইত। আমাদের বাল্যকালে সিমুলিয়া দল খুব বিখ্যাত ছিল। এই দলের সহিত চাতরার দলের ঝগড়া চলিত। হাবু দত্ত বাঁশি ধরিয়া মহড়া বাজাইত। সিমলার দল কয়েকবার জিতিয়াছিল।

সখের যাত্রা

তখনকার দিনে মদন মাষ্টারের যাত্রা, বৌ-মাষ্টারের ভাঙা দল

এই সব বিখ্যাত যাত্রা ছিল। আরও অনেক ছোট ছোট যাত্রা ছিল, তবে সেগুলো বিখ্যাত নয়।

সখের যাত্রা উঠিলে অভিমন্যুবধ যাত্রা বিখ্যাত হইয়াছিল। আমি দুইবার শুনিয়াছিলাম। এই দলে বৌবাজার, সিমলা ও বাগবাজারের সমস্ত গুণী লোক থাকিত এবং বেণী ওস্তাদ প্রভৃতি বড় বড় গাইয়েরা বিচার করিতে বসিত। কেষ্ট আর অর্জুন যে দুজন সাজিত, চেহারায় হুবহু সৌসাদৃশ্য ছিল। অভিমন্যু অতি সুন্দর গাহিত। অভিমন্যুকে তাহার মাতা সখিগণের সহিত বরণ করিয়া যুদ্ধে পাঠাইতেছে, সেই সময় যাত্রা জমিয়া উঠিত, সকলে গাহিত—"আয়লো আয় সবে আয় বরণডালা মাথায় করে" ইত্যাদি। কিন্তু যে উত্তরা সাজিত তার যেমন গলা মিঠি তেমনি ছিল গানের বাঁধুনী। তার গানে সকলে হাপুস নয়নে কাঁদিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তরা গাহিত। এমন করুণ সুরের গান খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়।

"পাণ্ডব অর্জুন" নামে আর এক সখের দল উঠিয়াছিল, তাহাতেও বড় বড় গাইয়ে ছিল। আমি একবার শুনিয়াছিলাম। কিন্তু অল্পদিন সেটা চলিয়াছিল, পরে দল ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময় যাত্রার দলে কেলুয়া ভুলুয়া উঠিয়া গিয়া প্রহসনের পালা আসিল। তখনকার দিনে দুই সতীনের ঝগড়া এইটাই বেশী চলিত। এই প্রহসন পরে অতি কদর্য ভাব ধারণ করিয়াছিল। এক যাত্রায় উড়ে প্রহসন ছিল। এক উড়ে আসিয়া তালপাতা ও লোহার ডগাওয়ালা খুন্তি দিয়া তালপাতায় দাগ কাটিয়া লিখিতে লাগিল, "কটক মড়ক বড়, বপর চড়ন গড়, টঙ্ক পঠব ত পঠব, ন পঠব ত, দন্ত ছরকট মরব।"

থিয়েটার

প্রথমে ন্যাশনাল থিয়েটার হয়। এখন যেখানে মিনার্ভা, সেখানে

পুরানো ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল এবং ছাতুবাবুর মাঠে বেঙ্গল থিয়েটার ছিল। মাইকেলের মেঘনাদ বধ, দীনবন্ধু মিত্রের বই, বঙ্কিমবাবুর বই খুব অভিনয় হইত। একটা বিশেষ গান তখন সকলের কাছে প্রচলিত ছিল যথা, 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা। দেখ্‌রে যবন দেখ্‌রে তোরা, যে জ্বালা জ্বালালি মোদের সবে সাক্ষী রহিল দেবতা সবে, এর প্রতিফল ভুগতে হবে।" পরে আরও অনেক রকম হইয়াছে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

পুতুলবাজি

আমাদের শৈশবে পুতুলবাজির বড় হুড়োহুড়ি ছিল। কাঠের পুতুলে রং করে নানা ভাবে কাপড় পরান হ'ত, লম্বা লম্বা বিছানার চাদর বাঁশ পুঁতে ঘিরিয়া ঘর করিত এবং তার দিয়া ঝুলাইয়া পুতুলওয়ালা সেই কাঠের পুতুলগুলিকে নানা ভাবে নাচাইত এবং মুখে তালপাতার টুকরো জোড়া করিয়া দিয়া এক রকম অস্পষ্ট নাকী সুরে মত কথা কহিত। প্রথমে একটা তাক হইত তাহাতে দিল্লীর বাদশাহ পুতুল সেজে বসিত। সেটা যেন দরবার বাড়ী। দরবারের সম্মুখে অনেক প্রকার পুতুল আসিয়া নানা প্রকার নাচ দেখাইত এবং পুতুলওয়ালা উপর থেকে তার দিয়া পুতুলের হাত পা নাচাইত। ইহাতে বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। মাঝে মাঝে কেংলা আসিত ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য কেংলা আসিয়া সুরু করিত "ও বাবা সন্দেশ খাব, ও বাবা সন্দেশ খাব" এবং বাজিওয়ালাদের অপর লোক যাহারা বাহিরে বসিয়া থাকিত তাহারা চিঁ চিঁ শব্দ করিয়া সকলকে বুঝাইত যে কেংলা সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছে। সকলেই কিছু কিছু পয়সা দিল। খানিক পরে আবার কেংলা বাহির হইয়া বলিল, "ও বাবা বে করব, ও বাবা বে করব।"

আবার এই রকম করিয়া পয়সা চাঁদা লইত। অর্থাৎ নাচের একটা পালা সমাপ্ত হইলেই কেংলা বাহির হইয়া কিছু চাহিত।

তখন কলিকাতায় সকল বাটীতেই পাতকুয়া ছিল এবং ছোট ছেলেরা পাছে পাতকুয়ার ভিতর পড়িয়া যায় সেইজন্য সকলে বলিত পাতকুয়ায় ভূত আছে। পুতুলবাজিতে সেইজন্য এক পাতকুয়া ভূত বাহির হইত। চেঁচাড়ীর একটা ঘেরা করে তাতে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়েছে, সেটা হল পাতকুয়া, আর তার ভিতর থেকে একটা পুতুল বেরত—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লম্বা চুল, লম্বা দাড়ী আর লাল কাচের দুটো বড় বড় চোখ। ছোট ছেলেরা সেই পাতকুয়া ভূত দেখে বড় ভয় পাইত। সেই ভূতটা অনবরত হাঁ করছে আর মুখ বন্ধ করছে। সে পয়সা ছাড়া আর কিছু খেত না। ছোটছেলেরা কাছে আগাইতে সাহস করিত না। পুতুলওয়ালা মারফৎ সেই পাতকুয়া ভূতকে পয়সা দিত আর সে অমনি খাইয়া ফেলিত। এই হইল মোটামুটি পুতুলবাজির কথা। তারপর বাজিওয়ালাদের মধ্যে একজন বেরিয়ে এসে কাঠকয়লার খুব গনগনে আগুন করিত। নিজের মুখের ভিতর কোন একটা জিনিস দিয়ে পরে জ্বলন্ত আগুন মুখে পুরে নিত। মুখ দিয়ে ফু ফু করে হাওয়া বার করত আর আগুনের ফুলকিগুলো চারিদিকে যেত, যে না পয়সা দিত তার দিকে আগুনের ফুলকি ফেলিত।

বাঁশবাজি

আমাদের শৈশবে বাঁশবাজির বড় হুড়োহুড়ি ছিল। বাজি-ওয়ালারা প্রথমে আসিত, আসিয়া শকুনির পালক বসান আর শকুনির ঠোঁট দেওয়া একটা কাঁথার জামা পরিত। আর ঠিক যেন দেখতে একটা বড় শকুনি সেজে উঠানময় ঘুরে বেড়াত, পয়সা না দিলে পায়ে ঠুকরাইতে যাইত। তাহার পর দুটো বাঁশ পুঁতে তাহার

উপর দড়ি বাঁধিয়া একটা লোক হাতে লম্বা বাঁশ নিয়া দাঁড়াইত এবং সেই হাতের বাঁশের উভয় দিকে ভার রাখিয়া দড়ির উপর চলাফেরা করিত, মাঝে মাঝে চিৎকার করিত, "হায়রে পয়সা, হায়রে পয়সা।" তাহার পর একটি কাঠির উপর থালা দিয়া ঘুরাইত। একটা কাঠির সহিত আর একটা কাঠি যোগ করিত। ক্রমে দশ, বারো, পনেরটা কাঠি যোগ করিত। শেষ কাঠির ডগা নিজের নাকের উপর রাখিত, কিন্তু থালা অনবরত ঘুরিত। বুলগেরিয়ার ভ্রোজা (Vroja) নামক নগরে বাসকালে অর্থাৎ এক অংশে সারবীয়া (Serbia) এবং নদীর ওপারে রুমানীয়া (Rumania), সেইখানে আমাদের দেশের মত বাঁশবাজী দেখিয়াছি। পূর্ব ইয়োরোপের বহু অংশে ভারতবর্ষের মত অনেক আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে।

গোয়াবাগানের কালীয় দমন

গোয়াবাগানের ঈশ্বর মিলের লেন সবে হইয়াছে। ময়দার কলের ঘেঁসগুলো ফেলেছে, মাঝে মাঝে মেটে খোলার ঘর এবং বাওচিত্তের গাছ দিয়ে বেড়া। এখন সেটা কোন স্থান নির্ণয় করা যায় না কিন্তু গোয়াবাগানের মধ্যে এক স্থানে একটা পুকুর ছিল, সেইখানে বারোয়ারী হ'ত। বিশেষতঃ এই পুকুরেতে কৃষ্ণকালীয়-নাগ ও অনেক নাগপত্নী কাঠের পুতুলে হইত। জলের ভিতর দিয়া নারিকেলের দড়ি এক রকম ভাবে ফাঁস দিয়া তৈয়ারী করিত। কিনারায় একজন দড়ি ধরিয়া টানিত এবং কোন কোন পুতুল ডুবিয়া যাইত অপর পুতুল ভাসিয়া উঠিত। পুরাণ বর্ণিত সেইরূপ পুতুলের চেহারা করিত। ইহাকে কালীয়দমন বলা হ'ত। সে এক বেশ খেলা ছিল।

হাটখোলার বারোয়ারী

হাটখোলা অঞ্চলটা আগে এত কারবারী স্থান ছিল না।

কলিকাতার বন্দর ছিল বেলেঘাটা। কথায় ছিল, "যার নেইকো পুঁজিপাটা, সে যাক্‌গে বেলেঘাটা।" তাহার পর হাটখোলা গুলজার হইল। বাঁশকে দু-ভাগ করে চিরে বেড়া দিয়ে গোলাঘর হইল এবং তাহাতেই মালপত্র থাকিত। এখন সেটা কোন স্থান নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু আমাদের শৈশবে আমরা ওখানে বারোয়ারী দেখিযাছি। বারোয়ারী পুতুলের ভিতর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ বড় সুন্দর হইয়াছিল। ভূতের চেহারাটা হচ্ছে কতগুলি কঙ্কাল, গায়ে মাংস চর্ম নেই, পেট থেকে নাড়াভুঁড়ি ঝুলছে এবং গায়ে কৃমি, কেঁচো, চোখগুলো কোটরের ভিতর বসে গেছে, আর তাই থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছে। এদিকে বাপ মরে গেছে, কাছা পরে শ্রাদ্ধ করতে বসে গেছে, আঙ্গুলেতে কুশের আংটি পরে সমুখে কলাপাতায় চালকলা তিল দিয়ে বাপের পিণ্ডি চটকাচ্ছে আর একটা ভটচাযি ভূতকে মন্ত্র পড়াচ্ছে। যজমান্ শ্রাদ্ধ না করলে চলবে কেন! আর ভূত করছে কি একবার পিণ্ডি চটকাচ্ছে আর ঘাড় ফিরিয়ে পুরুতের দিকে চাইছে। আবার পাছে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গে এইজন্য পুরুত মুখটা বাঁকা করেছে, মন্ত্র পড়াচ্ছে আর ভাবটা যেন পিছন দিক দিয়ে দৌড় মারবে। এমন হাস্যোদ্দীপক মূর্তি খুব কম দেখা যায়। সকলে দেখিয়া খুব তারিফ করিয়াছিল।

পুতুলে চিত্রগুপ্তের চেহারার বর্ণনা

আর একটা পুতুল হইয়াছিল বৃদ্ধ চিত্রগুপ্ত। পরনে থান কাপড়, পাটে পাটে কোঁচান কাপড়খানি অনেক দিনের পরা, এজন্য ময়লা হয়েছে। বুকে একটা দড়ি বাঁধা বেনিয়ান, মাথায় সাদা চুল কোপ্‌চে কাটা অর্থাৎ কদম ফুলের চুল, কানের চুল সাদা, সাদা গোঁফটি ছাঁটা এবং নাক দিয়ে নস্যিওলা কফ বেরিয়েছে বাঁ দিকে, নস্যির নাক, নাক মুছা সিক্‌নি মাখান একখানা ন্যাকড়া, জামার

এক জেবে একটা নস্যির কৌটা আর চশমা রাখার একখানি কাঠের খাপ, অপর জেবে একটি আফিমের কৌটা। মাথার পিছন দিকে সুতো বাঁধা চশমা নাকের ডগায় ঝুলছে যেন কি দেখিতেছে। সমুখে খাতাপত্র ও একটি মাটির দোয়াতের কালিতে ন্যাকড়া দেওয়া, তাতে একটা খাগের কলম আর কালি শুকাইবার জন্য সমুখে একটা চুনের পুঁটলি, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ অর্থাৎ ঠিক কালো নয়। এই চিত্রগুপ্তের চেহারা বড় সুন্দর হয়েছিল।

কাঁসারীপাড়ার সঙ

আগে চড়কের নীলের দিনে কাঁসারীপাড়ায় সঙ হইত। প্রথম প্রথম তাহারা বেশ ভাল গান করিত কিন্তু শেষ কয়েক বৎসর নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৮৮১-তে আমি ও আর কয়েকজন মিলে কৃষ্ণদাস পালের বাটীর উপরকার বারান্দায় যাইলাম। কৃষ্ণদাসবাবু এই বারান্দায় বসিয়া নিজের অফিস করিতেন। খানিক পরে বাউল সাজিয়া একদল লোক আসিল, নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠি, গায়ে নামাবলী পায়ে ঝুমুর। উপরে উঠিয়া কৃষ্ণদাসকে লক্ষ্য করিয়া তাহার কুৎসা করিয়া গান করিতে লাগিল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে, হরি ভজে কি হবে চপ, কাটলেট, কোপ্তা খাও বাবা গবাগব, দ্বিতীয়বার খাও বাবা গবাগব, হরি ভজে কি হবে।" এই বলে সকলে ঘুরে ঘুরে নাচ আর নানা রকম ভঙ্গিমা করিল। কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় অনেক ইংরাজদের সঙ্গে মিশিতেন এবং যখন মিউনিসিপালিটি তৈয়ারী হয় তখন এক ভোজে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় এবং তিনি আহার করিয়াছিলেন কি না জানি না কিন্তু অপবাদে তাহাকে অপমান করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সঙ একটা গরুর গাড়ার উপর কালো কাগজ দিয়ে শিবের মন্দির করেছিল। তাতে একটা প্রকাণ্ড কাগজের শিব করেছিল এবং 'কুচবিহার

বিবাহ' অর্থাৎ কেশববাবুর কন্সার সহিত বিবাহের ব্যঙ্গ করিয়া বাহির করিয়াছিল। এই দুই কারণে ভদ্রলোকরা সঙ-এ বড় বিরক্ত হইল এবং সেই বৎসর হইতেই সঙ উঠিয়া গেল। কিন্তু আব্বাস নামে মাণিকতলার এক মুসলমান, যে ভিস্তি সাজিয়া নাচিত, গাহিত, তাহা বড় সুন্দর হইত। মখ্মলে জরি দিয়া এক মশক করত এবং পেঁজা তুলো মশকের মুখে দিত যেন জল বার হচ্ছে। নিজেও মখ্মলের জামা টুপি পরত এবং পায়ে ঝুমুর দিয়া নিজের দলবল লইয়া নাচ গান করিত। অনেক গান তার নিজের বাঁধা ছিল। ভিস্তির গান অতি সুন্দর হইত। "দরিয়াকো মিঠা পানি" এই বলিয়া গান সুরু হইত।

ভূকৈলাসের হঠযোগী

আমরা যখন ছোট ছেলে তখন কালীঘাটে যাওয়া এক বিষম বিভ্রাট ছিল। জাহাজের গোরারা ও কেল্লার গোরারা গড়ের মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং লোকজনের উপর বড় উৎপাত করিত। যাহারাই কালীঘাটে যাইতেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভূকৈলাসের শিব দেখিতেন—ভূকৈলাস খিদিরপুরের কাছে। ভূকৈলাসের ঠাকুর বাড়ীতে এক হঠযোগী ছিলেন। কলিকাতায় তখন এইরূপ প্রবাদ উঠিয়াছিল— কথাটা সত্য কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় নাই। তবে তখনকার প্রচলিত মত লিপিবদ্ধ করিলাম। মাত্‌লা বা পোর্ট ক্যানিং যেতে তখন রেলের লাইন হইতেছিল। রেল বসাইবার জন্য মাটি কাটিয়া রাস্তা হইতেছিল, এক জায়গায় একটি পেরেক বাহির হইল। মাটি-কাটারা সেই পেরেক তুলিতে পারিল না। তাহারা রাগিয়া পেরেকের চারিদিক খুঁড়িল, পেরেক কিন্তু ক্রমেই বড় হইতে লাগিল। মাটি-কাটারা চারিদিক খুঁড়ে গর্ত করে পেরেক বার করতে গেল। তারপর গাঁতি দিয়ে যখন

খুঁড়িতে গেল নীচ থেকে যেন ফাঁপা ঢপ্ ঢপ্ আওয়াজ বার হইল। মাটি-কাটারা কর্তাকে জানাইল এবং মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাকা ছাদ বাহির হইল। অবশেষে দেখিল এক শিব মন্দিরের ছাদ। ক্রমে মন্দির বাহির হইল। মন্দিরের ভিতর একটা যুবক বসিয়া আছে দেখা গেল। তাঁর কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ি, বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, একেবারে নিশ্চল, নিষ্পন্দ। তাঁহাকে বাহির করিয়া ভূকৈলাস রাজবাটীতে রাখিল। অন্য বিগ্রহের যেমন প্রদীপ দিয়া আরতি হইত তাঁহারও সেইরূপ করা হইত; আহারও নাই, মলমূত্রও নাই। এইরূপে কিছুকাল চলিল। তারপর মেডিক্যাল কলেজের সাহেব ডাক্তারদের খেয়াল হইল কিরূপে মানুষ এইভাবে থাকিতে পারে। মৃত হইলে দেহ পচিয়া যাইবে, ইহাকে মৃত বলা যাইতে পারে না, অথচ রক্ত চলাচলের কোন চিহ্ন নাই। এ-এক কি আশ্চর্য ব্যাপার। ছেলেবেলায় এইরূপ শুনিতাম যে সেই হঠযোগীকে গলায় শিকল বাঁধিয়া পুকুরে ডুবাইয়া রাখিল। হঠযোগী পদ্মাসনে বসা, গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দেওয়া হইল, তাহাতেও কিছু হইল না। অবশেষে ইংরাজ ডাক্তাররা নাকে কি শুঁকাইল তাহাতে সে মাথা নাড়িতে লাগিল এবং জ্ঞান আসিল। সে অস্পষ্ট স্বরে চিঁ চিঁ করিতে লাগিল। জ্ঞান আসিলেই আহারের আবশ্যক হয়; তখন তাহাকে অল্প অল্প আহার করাইল এবং মলমূত্র ত্যাগ হইল। অল্পদিন পরে সেই হঠযোগীর দেহত্যাগ হয়। তখন বৃদ্ধেরা দেখিয়া আসিয়া নানা গল্প বলিত, তাহার অল্পমাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল। আমাকে কেহই দেখাইতে লইয়া যাইত না সেজন্য আমি কাঁদিতাম ও রাগ করিতাম। তবে বৃদ্ধদের গল্প অনেকটা বাড়ানও হ'তে পারে।

হোসেন খাঁ জিন্নী

কলিকাতায় আমাদের শৈশবে হোসেন খাঁ নামক এক পিশাচ-

সিদ্ধ আসিয়াছিল। তার জন্মস্থান দিল্লী কিন্তু বহু বছর ধরিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছিল। সারদানন্দ স্বামীর পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী একবার দেখিতে গিয়াছিলেন। এক ভদ্রলোকের হীরার আংটি জানলা দিয়া ফেলিয়া দিল সেটা যুবক গিরীশচন্দ্রের জেব হইতে বাহির হইল। কলিকাতার কোন ডেপুটি কাছারীতে যাইতেছিলেন, হোসেন খাঁ তার গাড়ীতে জোর করে বসিল এবং মদ খাওয়াও মদ খাওয়াও বলিয়া বড় উৎপাত করিতে লাগিল এবং খানিক পরে ডেপুটিবাবুর পাগড়ি শূন্যে ফেলিয়া দিল। অবশেষে শুঁড়ির দোকানের কাছে গাড়ী থামাইয়া হোসেন খাঁকে মদ খাওয়াবার পর কাছারীর দোরগোড়ায় হোসেন খাঁ গাড়ী থেকে হাত বাড়ালো আর পাগড়ি এসে পড়্‌লো। কলিকাতার সিমলায় কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য লোকের বাটীতে বেলা তিনটার সময় হোসেন খাঁ আসিল। ভিতরকার সিন্দুকের ভিতর টাকার তোড়া রেখে সিন্দুকে চাবি দিয়ে লোহার শিকলি বেঁধে এবং তার উপর কয়েকজন দারোয়ান বসিল। হোসেন খাঁ ভিতরে যাইয়া সেই সিন্দুক স্পর্শ করিল এবং সদর বাড়ীর বৈঠকখানায় গল্প করিতে লাগিল। খানিক পরে দেখা গেল যে সিন্দুকে টাকা নাই। আমাদের বাড়ীর অনেকে উহা দেখিতে গিয়েছিলেন কিন্তু আমাকে লইয়া যান নাই।

গাজীপুরে অবস্থানকালে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এই গল্প করিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ সেনেদের বাড়ী সর্বদা যাইত এবং মদ খাইবার পয়সার জন্য বড় উৎপাত করিত। কেষ্টবিহারীবাবু বলিলেন যে, কেশববাবু আর তাঁর ভাইয়েরা একখানা রুমালে যে যা ভাষা জানিতেন, সে সেই ভাষায় নিজ নিজ নাম লিখিলেন। হোসেন খাঁ সেই রুমাল পুড়িয়ে ছাই করে একটা গেলাসের জলে মিশিয়ে বাহিরে ফেলে দিল কিন্তু পরে সেই

সব লেখা সমেত রুমাল ময়লা বালিসের নীচে থেকে বেরুল। কেষ্টবিহারীবাবু আর একটা গল্প বলেছিলেন যে, তাঁহারা একবার হোসেন খাঁকে কাবুল হইতে নানারকম ফল আনিতে বলিলেন। খানিক পরে দেখেন পাশের ঘরে নানারকম সেইসব ফল রহিয়াছে। তাঁহারা সে সব আহার করিয়াছিলেন। এইরূপ শুনিয়াছি যে, সে কলিকাতায় হ্যামিলটনের বাড়ীর সমস্ত ঘড়ি একবার সরাইয়া ছিল। তাই বৃদ্ধ বয়সে তার জেল হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কাশ্মীর অবস্থানকালে আমি এক পিশাচসিদ্ধকে করকচ লবণকে মিছরী করিতে দেখিয়াছি এবং মুখে দিয়াও দেখিয়াছিলাম সত্য সত্যই মিশ্রি হইয়াছিল। নুন আমি নিজের হাতে দিয়েছিলাম, ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারি নি। তবে যে লুকাইয়া বদলাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। আমার নিজের সমুখেই সব হইয়াছিল।

গহনা

আমরা খুব শৈশবে দেখিতাম যে সধবা স্ত্রীলোক বিশেষ করে গিন্নীদের অন্যরকম অলংকার ছিল। পৈঁছে, খাড়ু, নারিকেলফুল-বাউটি এইসব হাতের অলংকার ছিল। কলিকাতায় বিশেষতঃ বড় ঘরে গহনা সোনায় নির্মিত হইত কিন্তু সাধারণ লোকে বিশেষতঃ গ্রামদেশের গিন্নীদের সব অলংকার রূপার হইত। তখন সাধারণ লোকের ভিতর সোনার প্রচলন এত হয় নাই। উপর হাতে জশম, তাবিজ এইসব অলংকার ছিল। কানে ঝুমকো, ঢেঁড়ী, তাসা এইরূপ ভারী ভারী অলংকার ছিল। সাবেক গহনায় কানে কানবালা ছিল যথা—"কানবালাটি গড়িয়ে দেবো ভাদ্রমাসের ধানে।" কানে সেটা চামরের মত ঝুলিত ও তাহাতে সোনার তেঁতুল পাতা থাকিত।

আমার ঝিমা মৃত্যুকালে তাঁর কানের গহনা জয়পুরের গোবিন্দজীকে দিয়ে যান। সে গহনাটা হ'ল একটা ঢিবি সোনার চাকতি তার চারিদিকে মুক্তা দেওয়া আর একটা মোটা আংটা দিয়ে তাহা পরিতে হইত। মেয়েদের বিবাহের সময় গহনার ফর্দ হইত বাউটি প্লুট গহনা অর্থাৎ বাউটি এবং তৎসংক্রান্ত সব জিনিস। ব্যাটা-ছেলেদের ভিতর তখন অলংকার পরার প্রথা ছিল। আমি তখন বড় ছেলে অর্থাৎ ৬।৭ বৎসরের তখনও পর্যন্ত হাতে তারের বালা ও কোমরে তাবিজের মত ছিল এবং ছোট মেয়েদের গলায় হাঁসুলি থাকিত। ছোটমেয়েরা ও সধবারা চুল বাঁধিবার সময় খোঁপাতে সোনার অভাবে ছুটো রূপার পুঁটে দিত। আমার বোনেদের মাথায় রূপোর পুঁটে থাকিত অর্থাৎ এক প্রকারের বাহারে মাদুলী। রাজপুতনায় কুমারী ও সধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় একপ্রকার অলংকার পরে, নাম "শিরোমণি"। বাঙ্গলাদেশের মেয়েরা খোঁপাতে পুটে পরিত। ইহা একটি শুভলক্ষণ ছিল। অনেকে কোমরে রূপা বা সোনার গোট পরিত এবং এই কটিবন্ধন অনেক প্রকারের ছিল। সংস্কৃতে ইহাকে মেখলা বলে। প্রাচীনকালে এই মেখলা বা কটিসূত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল। পাড়াগাঁয়ের ঝি চাকরাণীরা কোমরে ঘুনসি পরিত। তাহারা বলিত কোমরে ঘুনসি না পরিলে হজম হয় না। কলিকাতায় ভদ্রলোকদের ভিতর ঘুনসি পরা বড় লজ্জার বিষয় ছিল। মাথায় সিঁথি পরা অতি প্রাচীন প্রথা। তখনকার দিনে সিঁথি পরার প্রচলন ছিল কিন্তু মেয়েদের মাথায় ঝাপ্‌টা পরা নবাবী প্রথা ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে দিল্লীর "তুলী বেগম", আকবরের কোন এক বেগম, প্রথম ঝাপ্‌টা নির্মাণ করান। এটা শুধু প্রবাদ মাত্র, বিশেষ প্রমাণ নাই।

তখনকার দিনে অধিকাংশ গহনা মোটা মোটা হইত এবং মাদুলীর নানা রূপান্তর। সেই সবগুলিকে রেশমের সুতা দিয়ে

সংযোজিত করা হইত। নাভির নিচে সোনা ব্যবহার হইত না, এইজন্য পায়েতে রূপার মল দিত। তখনকার দিনে ডায়মণ্ড কাটা মল ও বেঁকমল ছিল। একটা রূপার পাতকে বাঁকাইয়া বেঁকমল করিত। তাহা দুগাছা কিংবা চারগাছা করিয়া পরিতে হইত। আর তা না হইলে একগাছা মোটা কড়ার মতন মল পরিত। তাহার গায়ে নানারকম ডায়মণ্ড কাটা থাকিত। ছোট মেয়ে ও বিয়ের কনেরা ঝাঁঝর মল পরিত অর্থাৎ মলের ভিতরটা ফাঁপা আর তাহার ভিতর সীসের কড়াই থাকিত। তার নীচের দিকে একটা আংটি মত তার থাকিত তাহাতে ছোট ছোট ঘুমুর গাঁথা থাকিত। সেই ঝাঁঝর মল পরিয়া চলিলে বেশ ঝুম্ ঝুম্ করিয়া আওয়াজ হইত। আমরা শৈশবে পায়ে পরিবার এবং কানের গহনা এইপ্রকার দেখিয়াছি। বেঁকী তার ইত্যাদি অল্পদিনের ভিতর উঠিয়া গেল। সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী স্ত্রীলোকদের ভিতর সেইরূপ অলংকার দেখিতে পাওয়া যায়।

তখনকার দিনে নাকে নথ পরার খুবই প্রচলন ছিল। ছোট মেয়েরা নাকের মাঝখানে একটা নোলক পরিত। "শ্রীমতী গো রাধে কলসী কাঁকে নোলক্ নাকে যাচ্ছে জলের ঘাটে" এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা নাকে মাঝারী গোছের একটা নথ পরিত, তাহাতে দুইটি মুক্তা এবং মাঝে একখানি চুনি এবং মুক্তার দুল থাকিত। জেলে বা ছোট জাতের স্ত্রীলোকদের নথটা প্রকাণ্ড হইত, থুতনির নীচে পর্যন্ত। তখনকার দিনে মেয়েদের ভিতর ঝগড়া হইলে বলিত "তোর নথ নেড়ে কথা কইতে হবে না।" হরিদ্বার অবস্থানকালে গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা কাঠ, ঘুঁটে বিক্রয় করিতে আসিত, দেখিতাম তাহাদের নথগুলো বড় বড়। এই নথ পরা ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা, এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত নাকে নাকছাবি অর্থাৎ একটা লবঙ্গের মত

ফাঁপা নল করিয়া নাকে দিবার প্রথা ছিল এবং নাকের অপর আরও অলংকার ছিল।

যাহারা সঙ্গতিপন্ন লোক তাহারা জড়োয়ার জিনিস ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ অনেক হীরা মুক্তার জিনিস। মুক্তার সেলী, সাতনরী, চন্দ্রহার প্রভৃতি অনেক প্রকার হীরা মুক্তার অলংকার ছিল সে সব এখন অপ্রচলিত।

গ্রামদেশে বাগ্‌দী, ছলে এই সব স্ত্রীলোকেরা কাঁসার অলংকার পরিত। তাহাকে রূপকাঁসা বলিত অর্থাৎ কাঁসার সহিত রূপা মেশান থাকিত। সেইরূপ কাঁসার অলংকার নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য মেয়েরা ব্যবহার করিত, কলিকাতায় এ সবের প্রচলন ছিল না।

সধবা স্ত্রীলোকেরা পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ঘুঁঙুরওয়ালা চুটকি পরিত এবং কেহ কেহ অন্য আঙ্গুলে রূপার আঙোট পরিত। কিন্তু উড়ে বাবাজীরা অনেকদিন পর্যন্ত রূপার চন্দ্রহার পরেছিল, এখন পরে কি না জানি না। আমরা ছেলেবেলায় বলিতাম, "দুলিছে দড়মড় কোমরে চন্দ্রহার"।

আমাদের অতি শৈশবে দেখিতাম গলার অলংকার মাদুলী ভাবের। সে সব নানাভাবে রেশম দিয়া গাঁথিয়া গলায় পরিত। রূপা বা সোনার আটপল (Eight faced) কড়াই করে তাতে আংটি দিয়ে মালা করিয়া পরিত। নাম ছিল সাতনলী (সাতনরী) পাঁচনলী (পাচনরী)। আমরা ছেলেবেলায় এই সব সাবেক গহনা দেখিলে বিরক্ত হইতাম ও ঘৃণা করিতাম।

আমাদের ঠাকুরমাদের ও মায়েদের সময় এই দুইয়ের মধ্যে বাংলাদেশে একটা পরিবর্তনের যুগ আসিল। রূপার চলন উঠিয়া গিয়া সোনার চলন হইল এবং মাদুলী শ্রেণীর গহনা উঠিয়া গিয়া নূতন শ্রেণীর গহনা হইল। তখনও হাঙরমুখো, পুঁটেমুখো বালা, তাগা, জশম তাবিজ এসব ছিল। কানের গহনা তারপাশা, ঝুমকো

ইত্যাদি উঠিয়া গিয়া মাকড়ীর প্রথা উঠিল এবং পরে ঢুলও উঠিয়াছিল। ঢুলটা অবশ্য বিলাতী চলন। আমরা ছেলেবেলায় মেমেদের ছবিতে কানে ঢুল দেখিতাম এবং কান বিঁধানো এক নূতন প্রথা উঠিল। বুড়ীদের কানে গোটাকতক ছেঁদা থাকিত। তাহার পর কানে সাত আটটা ছেঁদা আর সারবন্দি মাকড়ী, এই মাকড়ীর আকৃতির নানাপ্রকার পরিবর্তন হইতে লাগিল। এখন তাহার কোন নির্ণয় করা যায় না। বুড়ীদের গলায় চিক দেখি নাই তাহারা মাদুলী শ্রেণীর গহনা পরিত। আমাদের শৈশবে প্রথম চিক উঠিল এবং একরকম তারাহার উঠিয়াছিল। সোনার একটা তার করিয়া, আলপিনের মাথা চেপ্‌টা করিলে যেমন হয় সেইরকম চেপ্‌টা মাথা, তার ঝাঁপা করিয়া বিনান, যেন একটা বিড়ালের লেজ, তবে তারের মধ্যে সব ফাঁক—এই হইল গহনার অবয়ব। আর মুখের কাছে জশমের মত স্প্রিং দিয়ে আটকান হইত। আমার মার এই তারাহার ছিল, আমরাও মাঝে মাঝে পরিতাম। সোনার পাতলা তার করে তাকে বিনিয়ে ঝাঁপা একটা অলংকার করিত, সেটা গলায় পরিত। তাহার পর বিছাহার, গোটহার এই প্রকার অনেক রকম হার হইয়াছিল। আর এক প্রকার গহনা ছিল রতনচূড়—পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটা আংটি সোনার শিকলি দিয়ে মাঝখানে একটি সোনার চাকতির সহিত সংযুক্ত করা। আর সেই চাকতিটা কতকগুলো শিকলি দিয়া কবজির কাছে সোনার জড়ান পাতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, জিনিসটা খুব দামী হইত। দিনকতক পিঠে পিঠ-ঝাঁপা ছিল অর্থাৎ একটা ঝাঁপা করে তাতে রেশমের ফুল তারপর ফাঁক, আবার ঝাঁপা ও ফুল এইরূপ পাঁচ তবক, সাত তবক হইত। তখনকার দিনে চুল বাঁধার সময় বিনুণী বেণী করিত, রূপার বা সোনার গোট দিয়া বাঁধিত। তবে পুঁটে দেওয়াটা খুব প্রথা ছিল, কিন্তু এখনকার দিনে যে মাথায় ফুল দেয় সেটা তখনকার দিনে ছিল না,

এটা আধুনিক। কারণ তখন মাথায় লম্বা ঘোমটা দিতে হইত এইজন্যে মাথায় ফুল বা প্রজাপতি দেবার প্রথা ছিল না। এই হইল সাধারণভাবে প্রাচীন অলংকারের বর্ণনা।

চরকায় সুতাকাটা

আমরা শৈশবে চরকার খুব প্রচলন দেখিয়াছি। যজমান ব্রাহ্মণ এবং সাধারণের বাটীতে চরকার খুব প্রচলন ছিল। আমাদের বাটীর বাহিরের জায়গাতে ঘরকতক প্রজা ছিল। এক বুড়ী ছিল নাম সিধের মা, সে রাত্রে বসিয়া চরকার সুতা কাটিত এবং ঘুনসি ভাঙ্গিত। আমরা ছোট ছেলেরা মাঝে মাঝে সেই সিধের মার চরকা ঘুরাইতাম কিন্তু আমাদের সুতা ছিঁড়িয়া যাইত। আমাদের ঠাকুরঘরে একটা চরকা ছিল বুড়ীরা সেটা ঘুরাইত। তখনকার দিনে পুরুতের কাছে কথা শুনিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোক একটি পৈতা, একটি পয়সা, একটি পান ও একটি সুপারী দিত। পৈতা চরকার সুতায হইত। এইজন্য তখন চরকার প্রচলন ছিল।

বিশেষতঃ বিবাহ বা অন্যকার্যে চরকায় সুতাকাটা একটা প্রথা ছিল। এইজন্য ইংরাজদের কুমারী মেয়েদেব স্পিনিস্টার (Spinister—চরকাকাটুনী) বলে। সর্বদেশে চরকা কাটা প্রথা ছিল। এমনকি রাণীরাও চরকা কাটিতেন, "রাজার মা চরকাকাটুনী তিনজনে তার খেই ধরুনী।" কিন্তু বিলাতী কাপড় ও সুতা উঠা হইতে চরকার ব্যবহার একেবারে কমিয়া গেল। ঠাকুরের প্রদীপের সলিতা অনেক বাড়ীতে চরকার সুতার গোছ করে হইত। পরা-কাপড়ের পাকান সলিতা ব্যবহার হইত না। এইজন্য আমাদের বাড়ীতে ঠাকুরঘরে একটা চরকা ও তুলা থাকিত।

ঢেঁকি

কলিকাতায় অনেক বাটীতে তখন ঢেঁকির প্রথা ছিল। আমাদের

বাটীতেও ঢেঁকি ছিল কিন্তু সেটা বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের পাশের জমির রায়তদের ঘরে ঢেঁকি ছিল। পিঠের সময় চাল গুঁড়াইতে হইলে আমরা ঝি-দের সঙ্গে চাল গুঁড়াইতাম আর কাসুন্দির সময় কাঁচা আম, লংকা ও সরিষা গুঁড়াইয়া আনিতাম। ঢেঁকির গড়ে হাত দিলে পাছে থেঁতলে যায় এইজন্য আমাদের সরাইয়া দিত। কিন্তু ঢেঁকির উপর দাঁড়িয়ে চালের দড়ি ধরে আমরা পাড় দিতাম। তখন ধান কুটিবার জন্য ঢেঁকির ব্যবহার কলিকাতা সহরে তেমন ছিল না, কারণ তৈয়ারী চাল কলিকাতায় আসিত, ধান কুটিবার আবশ্যক হইত না।

মাটির ছাঁচকাটা

প্রাচীন বৃদ্ধারা দুপুরবেলা আহারের পর বসিয়া অনেক প্রকার মাটির ছাঁচ কাটিতেন। এইটা তখন শিল্পনৈপুণ্যের ভিতর ছিল, কারণ বাটীতে তখন নারিকেলের চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ হইত। এইজন্য মাটির ছাঁচের সব বাড়ীতেই আবশ্যক হইত এবং ছাঁচ কাটাতে যাহার হাত বিখ্যাত হইত পাড়ার লোক আসিয়া তাহার নিকট হইতে ছাঁচ লইয়া যাইত। আমার ঝিমা অর্থাৎ মাতামহীর মা এই মাটির ছাঁচ কাটতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী ছাঁচ আমাদের অনেকদিন ছিল এবং আমরা ব্যবহার করিতাম। তখনকার দিনে আহারের পর স্ত্রীলোকেরা তাসখেলা বা গল্প করিয়া সময় কাটাইতেন না। ঘুনসি ভাঙ্গা, ছাঁচকাটা, চরকা কাটা ইত্যাদি করিতেন। অনেকে ইহাতে কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতেন।

মিশি, মাজন ও উলকি

আগেকার দিনে দাঁতে মিশি দেওয়ার প্রথা ছিল। তুঁতে আর

কি কি জিনিস দিয়ে তৈয়ারী করে বেচতে আসত। সাদা দাঁত বুড়ীরা পছন্দ করিত না। সেগুলো দিলে দাঁত কালো হইত। তাহাতে একটা গন্ধ বাহির হইত, আমরা বড় বিরক্ত হইতাম। ক্রমে এ প্রথা উঠিয়া গেল। মাজন এক প্রকার ছিল সেও বোধহয় তুঁতে দেওয়া, তা দিয়ে দাঁত মাজিলে দাঁত ভাল থাকিত কিন্তু তাহাতেও তুঁতের গন্ধ বাহির হইত। ক্রমে দাঁত মাজিবার বিলাতী গুঁড়া আসায় মাজনের প্রথা উঠিয়া গেল।

তখনকার দিনে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা ও গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা উলকি পরিত। কপালে ভ্রূদ্বয়ের মাঝে, দাড়িতে এমন কি নাকের উপরেও উলকি পরিত। পূর্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের ভিতর অদ্যাপিও সে প্রথা আছে। আমরা তখন ছোট ছেলে, মুসলমান স্ত্রীলোকেরা আসিয়া উলকি পরাইত। ধামার চারদিকে আমরা ছোট ছেলেমেয়ে ঘিরিয়া বসিতাম। যার দুর্ভাগ্য সে প্রথমে উলকি পরিত। গোটাকতক ছুঁচ হাতে করে ছোট মেয়েটির কপালে বা হাতে বিঁধিতে লাগিল। আর ছোট মেয়েটি পরিত্রাহী চিৎকার করিত। তারপর ভেলা না কি মাখিয়ে দিয়ে তাতে চিরকালের কাল দাগ করে দিত। আমরা এই দেখে ছুট মেরে দৌড়ে একেবারে উপরে। মুসলমানী ত আর উপরে উঠতে পারে না তাই অব্যাহতি। উলকি পরা আমরা ছোটবেলায় দেখিয়াছি, তারপর ক্রমে উঠিয়া গেল। ইউরোপের পশ্চিমভাগে এই উলকি পরার এখনও বড় প্রচলন আছে। বিশেষতঃ যারা জাহাজে কাজ করে তাহাদের ভিতর এটার বিশেষ প্রচলন। তাহারা জাহাজের নোঙর, দড়ি ইত্যাদি বুকে পিঠে হাতে আঁকিয়া লয়। এই উলকি হইতেছে অতি প্রাচীন প্রথা। মানুষ যখন অসভ্য আদিম অবস্থায় ছিল, এটি তখনকার প্রথা, এখনও চলিয়া আসিতেছে।

চড়ক

আগেকার দিনে চৈত্রমাস পড়িলে গাজনে সন্ন্যাসীর বড় হুড়াহুড়ি ছিল। নন্দ চৌধুরীর গলির শেষ অংশে, এখন যেখানে অনেক কোঠা-বাড়ী হইয়াছে আগে ওটা, হাড়ীপাড়া ছিল। প্রধানতঃ এই হাড়ীরাই গাজনের সন্ন্যাসী হইত এবং একজন মূল সন্ন্যাসী হইত। এতদ্ব্যতীত অপর নিম্নশ্রেণীর লোকও সন্ন্যাসী হইত। একমাসকাল ইহারা অতি শুদ্ধাচারে থাকিত, গেরুয়া কাপড় পরিত এবং সন্ধ্যার সময় হবিষ্যান্ন ভোজন করিত। এই গাজনের সন্ন্যাসীরা চড়কের কয়েকদিন আগে ঢাক বাজাইয়া রাস্তা দিয়া যাইত। সেই সময় পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা রাস্তায় ধূলাতে কাঠি দিয়া একটা দাগ টানিয়া দিত। গাজনের সন্ন্যাসীর সেই গণ্ডি অতিক্রম করার নিয়ম ছিল না। তারপর লোকে প্রশ্ন করিত যথা—

"শুনরে সন্ন্যাসী ভাই আমার বাখান,
উত্তর দিয়া তুমি যাও অন্যস্থান।
এরণ্ড আর থাম খুঁটি, ভেরাণ্ডার বেড়া,
তার মাঝেতে পড়ে আছে মস্ত এক নোড়া।
বাটনা বাটিতে শিবের পুঁটকি হল ক্ষয়.
সেই শিবকে গড় করিলে কি পুণ্য হয়?"

বোধহয় এই হেঁয়ালি তারকেশ্বরের প্রথম অবস্থার উল্লেখ করিয়া রচিত হইয়াছিল। এইরূপ অনেক কবিতার প্রচলন ছিল। গাজনের সন্ন্যাসীরা প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলে মাটির দাগ মুছিয়া দেওয়া হইত এবং সন্ন্যাসীরা বিজয়ী হইয়া ঢাক বাজাইয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু উত্তর করিতে না পারিলে ঢাক বন্ধ করিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছে সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইবে এই ছিল তাহাদের দণ্ড।

আমাদের জন্মের কিছু পূর্ব পর্যন্ত অথবা আমার জ্ঞান হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাণ ফোঁড়ার প্রথা ছিল। চড়ক যেদিন হইবে, সেই দিন

প্রাতে গাজনের সন্ন্যাসীরা কালীঘাটে যাইত। যে কজন লোক বাণ ফুঁড়িবে তাহারা তৈয়ারী হইত। কে একজন বিশিষ্ট বলবান লোক ছিল সে গাজনের সন্ন্যাসীর পিঠে জোরে এক কিল মারিত, মারিলে পিঠ ফুলিয়া উঠিত। তখন বাঁ-হাতে পিঠের চামড়া টানিয়া ধরিয়া ডান-হাতে ধারাল বঁড়শির মত হুক বিঁধাইয়া দিত। পিঠে এইরূপ দুইটা বঁড়শি বিঁধাইত ও রক্ত বাহির হইত। কিন্তু সেই স্থানে গাওয়া ঘি গরম করিয়া মালিশ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইত। আবার কেহ কেহ বা জিভেতে ফুটো করে এক বিঘত, দেড় বিঘত অশ্বত্থচারা শেকড়শুদ্ধ সেই জিভের ফুটোতে বসাইত। এইরূপ বাণ ফুঁড়িয়া তাহারা রাস্তা দিয়া নাচিতে নাচিতে যাইত কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়ার পর পিঠে বাণ ফোঁড়া ছিল না। তখন নতুন গামছা পিঠে ভাল করে বেঁধে তাহাতে দুটো বাণ বা মোটা লোহার বঁড়শি আটকাইয়া দিত এবং তাহাতে নতুন শনের দড়ি ঝুলাইয়া দিত এবং ঢাক বাজাতে বাজাতে কালীঘাট হইতে আসিত। গাজনের সন্ন্যাসীদের কথাই ছিল, "তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগ্‌গে ম হা দে ব"।

ছাতুবাবুদের বাড়ীর দোর দিয়ে বিডন্ ষ্ট্রীট বাহির হইয়াছে আমার জ্ঞান হইবার আগে। কিন্তু ছাতুবাবুর মাঠ প্রকাণ্ড ছিল। ওখানে আমরা খেলা করিতাম। দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ মাণিকতলা ষ্ট্রীটের দিকে একটি বড় ফটক ছিল তাতে লোহার গরাদওয়ালা ঠেলা দুখানা কপাট ছিল এবং থামের দুপাশে বড় বড় ঝাউগাছ ছিল। তারপর সেই ফটকের পূর্ব পশ্চিমে একমানুষ উঁচু লোহার গরাদ দেওয়া বেড়া এবং মাঠের পূর্ব পশ্চিম প্রান্তে গাড়ি-ঘোড়ার আস্তাবল। এখন সেটা অনাথদেবের গলি হয়েছে। ওটা আগে বড় পগার ছিল এবং সেটার পশ্চিম দিকে অর্থাৎ কালীমন্দিরের গা দিয়ে একটা ছোট নালা ছিল। মাঠের উত্তর-পূর্ব দিকে শান বাঁধান চাতালওলা

একটা বড় পুকুর ছিল। সেটাতে চড়কের গাছ ভিজান হ'ত। সেইজন্য অনেকে সেটাকে চড়ক-পুকুর বলিত এবং মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে পরে বেঙ্গল থিয়েটার হয়েছিল। মাঠটা খুব বড় ছিল। গাজনের সন্ন্যাসীরা মাঠের মাঝখান থেকে একটু সরিয়ে পশ্চিম-দিকে বাঁশ দিয়ে মস্ত উঁচু ভারা করিত। তাহা হইতে সন্ন্যাসীরা হাত ছাড়িয়া পড়িত, পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নয়। একে ঝুল-ঝাঁপ বলিত। নীচেকার স্তরের এড়ো বাঁশ থেকে আমরাও লাফাইতাম। কিন্তু তেতলার বাঁশে উঠিতে আমরা সাহস করিতাম না। তারপর বঁটিঝাঁপ। শণচটের ভেতর ঘাস পুরে প্রকাণ্ড বড় গদি করিত। সেই গদির উপর তিন-চারখানা বেশ মাঝারী গোছের বঁটি খাড়া করে রেখে দিত আর মূল সন্ন্যাসী তেতলার বাঁশ থেকে শিবের নাম করিতে করিতে হাত ছেড়ে ঝুপ করিয়া পড়িত। কিন্তু কাহারও কিছু আঘাত লাগিত না। এ সকল কথা চিন্তা করিলে গা কাঁপে। বোঁচ-কাঁটা ডালশুদ্ধ এনে সেই খড়ের গদির উপর রাখিত আর সন্ন্যাসীরা কেউ দোতলার, কেউ তেতলার ভারা থেকে হাত ছেড়ে সেই কাঁটার উপর পড়িত। তারপর আগুন ঝাঁপ হইত। মাটির উপর কতকগুলো আগুন জ্বেলে দিত, আর তার উপর লাফিয়ে পড়িত। এই সব ঝাঁপ দেখিতে আমরা বিকেল থেকে যাইতাম এবং সন্ধ্যার পর পর্যন্ত থাকিতাম।

চড়কের দিনে ছাতুবাবুর মাঠে খুব মেলা বসিত। অনেক জিনিসের দোকান বসিত। চড়কগাছটা মাঠের মাঝখানে পোঁতা হইত। বাঁশ দিয়ে লম্বা করে একটা মোচ হইত। সেটা একটা বাঁশ ছ্যাঁদা করে চরকির কলের মতনটাতে আটকে ডগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। সেই মোচ থেকে দুটো দড়ি ঝোলান হইত। একটা দড়ি গাজনের সন্ন্যাসীর পিঠের বাণের সঙ্গে বাঁধা হইত। আর মোচের অপর কাছিটার মাটির দিকের ডগাতে একটুকরো বাঁশ,

কয়েকজন লোক তার উপর চেপে বসিত। এদিকে ভার হওয়াতে গাজনের সন্ন্যাসী দড়িশুদ্ধ শূন্যে উঠিত আর মোচটা চড়কগাছের সঙ্গে রুজুরুজু এড়োভাবে থাকিত। তখন সকলে রব তুলিত—“দে চড়কির পাক”। তখন বাঁশের উপর যেসব লোক বসেছিল খুব জোর পাক দিতে শুরু করিত। আর বুকে গামছা-বাঁধা সন্ন্যাসী বাবাজী শূন্য থেকে ঘোরপাক খেতেন। দুপায়ে নূপুর পরে যেতেন—পা ছুঁড়ে তাল বাজাতেন। গেরুয়ার ঝুলি করে কিছু ফল নিয়ে যেতেন সেই ফল ছড়াতেন। আর লোকে হুড়মুড় করে সেই ফল কুড়াইতে লাগিত। শূন্যেতে সন্ন্যাসী বাবাজী কতই হাসিতেন আর পা ছুঁড়িতেন। একে বলে চড়কে হাসি। প্রাণ যায় তবু মুখে হাসি। ঝুল ও অন্যান্য ঝাঁপেতেও সন্ন্যাসী ফল নিয়ে যেত আর সেই ফল ছুঁড়িত। তখনকার দিনে বিশ্বাস ছিল যে সেই ফল খেলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এইতো মোটামুটি চড়কের কথা। মেলার দিনটি নাগরদোলা ও ঘোড়ার চরকা বসিত।

দুলদুলের ঘোড়া

মুসলমানদের মহরমের সময় এখন যেমন টিনের পাঞ্জা ও ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা করে তখনও দুলদুলের ঘোড়া নিয়ে বেরুত। একটা শোলার বা চেঁচাড়ির উপর কাগজ মুড়ে বড় ঘোড়া করিত। তার গায়ে অনেক সোলার ফুল দিয়ে সাজাত, দেখতে খুব ভাল ও মজাদার হ'ত। ঘোড়ার যেখানটা বুক ও পেট পড়ে, সেখানে একটা মানুষ দাঁড়াত এবং ঘোড়ার গা ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে রাখত। লোকটা যেন ঘোড়সওয়ার। ঘোড়ার মুখে একটা লাল শালু দিয়ে লাগাম করত এবং উহা বাঁ-হাতে ধরিত আর ডান-হাতে বিনানো চামড়ার চাবুক থাকিত। সওয়ারের বেশভূষা ভাল হ'ত। ঘোড়ার পা চারিটা জমি থেকে উপরে থাকিত ঠিক যেন দৌড়াইবে। আর

লেজটাও সেই রকম তুলে আছে, এই তো হ'ল ঘোড়সওয়ার। সঙ্গে কয়েকজন লোক কেউ পাঞ্জা নিয়েছে, কেউ বাটি নিয়েছে, কেউ ঢোল নিয়েছে তারা মুসলমানী তালেতে লড়াইয়ের বাজনা বাজাইত ও নানারকম তালে বাজনা বাজাইত। আর ঘোড়সওয়ার বেগে মাটিতে চাবুক মারিত, ঘোড়াকে যেন খুব দৌড় করে ছুটাবে। আর মাটিতে পা ফেলে এমন নাচতে লাগত—কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও বাঁ-দিকে, কখনও ডান-দিকে যাচ্ছে, এরকম করে নিজের পায়ে নেচে ঘোড়ার নানারকম গতি দেখাত। সে এক তামাসার জিনিস ছিল। বাজনার সেই তালে তালে ঘোড়া দৌড়াইবার নানা ভঙ্গী সেই লোকটা দেখাইত। রাস্তায় লোক জমিত আর সকলেই একটা একটা করে পয়সা দিত।

তেলের মালা

এখনকার দিনে মুদীর দোকানে তেল আনিতে যাইলে দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে ওজন করে দেয় কিন্তু তখনকার দিনে নারিকেল তেল বা সরিষার তেল মাপ করিবার অন্য প্রথা ছিল। নারিকেল খোলের শেষ দিকটা কাটিয়া মালা করিত। বড়, মাঝারী, ছোট এইরকম পাঁচ ছয় রকমের মালা হইত এবং সেই মালার ঠিক নিচের দিকে ছোট একটা ফুটা করিত, তেলওলা দুটো আঙ্গুল দিয়া সেই নারকেল মালাটা ধরিত এবং মাঝের আঙ্গুল দিয়া ছেঁদাটা আটকাইয়া দিত। এক পয়সার দু পয়সার বা আধ পয়সার তেল যেমন হিসাবে হইত, সেই মালাটিতে ধরিত এবং খরিদ্দারের বাটির কাছে মালা লইয়া আঙ্গুল সরাইয়া লইত এবং ধীরে ধীরে বাটিতে তেল পড়িত। তখন এত দাঁড়িপাল্লার রেওয়াজ ছিল না। আমরা সেই রকম মালা ধরে তেল ঢালিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু পারিতাম না, হাতে ছড়াইয়া যাইত।

তেলের কুপো

যেটা এখন অক্সফোর্ড মিশনের বাটী হইয়াছে, ওটা পূর্বে কলুপাড়া ছিল। তখন ঘানির তেল চলিত। তখন সব কলুদের দুটো তিনটে করে ঘানিগাছ ছিল। কলুরা তাহাকে গাছ বলিত। তখন "ক্যানেস্ত্রা" উঠে নি। চামড়ার এক রকম কুপো ছিল। চারপলওলা বা চারকোণা প্রকাণ্ড বড় চৌকো সিন্দুকের মত চামড়ার কুপো ছিল। সেই কুপোর এক কোণে গলার মত একটি ফুটো করা ছিল। গলার উপর একটা মোটা বেড় ছিল। এই গলা দিয়ে কুপোর ভিতর তেল পুরিত এবং কাঠের একটা মস্ত গোঁজ ছিল, সেইটাই কুপোর ছিপি। চামড়াটা পাতলা ছিল কারণ ভিতরকার তেল দেখা যাইত। সেই কুপোতে দু-মনের অধিক তেল ধরিত। তখন কাঠের পিপে বা টিনের "ক্যানেস্ত্রা" এসব জিনিস ছিল না। চামড়ার কুপোতে তেল রাখা হইত এবং দুজন মুটে কাঁধে বাঁশ দিয়ে দড়ি দিয়ে সেটা ঝুলিয়ে নিয়ে যেত। ইহাতেই বোধ হইতেছে তেল অধিক ধরিত।

পুরান সিমলার বাজার

পাড়ার বুড়োদের কাছে শুনিতাম সিমলার বাজার প্রথমে— এখন যেটা মহেন্দ্র গোস্বামীর গলি, তাহার কোন এক স্থানে ছিল। একটা বড় শিমুল গাছ ছিল তাহার নীচে বাজার বসিত। আমরা কিন্তু ঐ শিমুল গাছ দেখিনি এবং ঐ স্থানটিতে খোলার ঘর দেখিয়াছি। আমাদের সময় যেটা সিমলার বাজার ছিল সেটা হ'ল এখনকার বেথুন কলেজের বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং খানিকটায় বেথুন কলেজের পশ্চিমদিককার রাস্তা হইয়াছে। ১৮৮২ খৃঃ পূজার পর হইতে শীতকাল পর্যন্ত এই সময়ই ছাতুবাবুর ফাঁকা মাঠেতে জেলেরা ও তরকারীর ফোড়েরা বসিতে থাকে এবং সেখানে

এক নতুন বাজার আরম্ভ হয়। পরে উভয় বাজারের মালিকের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া দুই বাজার চলিতে লাগিল। একটা হইল ছাতুবাবুর বাজার আর একটা হইল সিমলার বাজার। পরে বেথুন কলেজের কর্তৃপক্ষ জমিটা খরিদ করায় সিমলার বাজার একেবারে উঠিয়া গেল।

জোড়াসাঁকোতে আগে লালাবাবুর বাজার খুব গুলজার ছিল। অনেকে লালাবাবুর বাজারে যাইয়া জিনিস ক্রয় করিত। তখন নূতন বাজার এত জাঁকাল হয় নাই। পরে নূতন বাজার জাঁকিয়া উঠিল এবং লালাবাবুর বাজার নিভিয়া আসিল। এখন নামমাত্র লালাবাবুর বাজার আছে।

সাপখেলানোর কথা

কলিকাতায় আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি অনেক বাড়ীতেই পুকুর ছিল এবং কানাচ বা পিছনে খানিকটা খালি জমি থাকিত। সে জমিতে বেগুনগাছ, কলাগাছ হইত। কখনও বা কাঁটানটে গাছ হইয়া জঙ্গলের মত থাকিত। এজন্য অনেক বাড়ীতেই সাপের বাসা ছিল। আমাদের বাড়ীতেও কয়েকটা গোখরো সাপ ছিল কিন্তু কাহাকেও কামড়ায় নাই, পরে ডোমপাড়ার কর্তা বংশী ডোম আসিয়া একে একে কয়েকটা সাপ ধরিয়া লইয়া যায়।

এখন মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানী লোক আসিয়া তুবড়ি বাজাইয়া সাপ খেলায়। কিন্তু আগে বাঙ্গালী মালেরা সাপ খেলাইতে আসিত এবং তাদের পেটরার ভিতর থেকে ময়াল সাপের বাচ্চা দেখাইত। হিন্দুস্থানী সাপুড়েরা তুবড়ি বাজাইত কিন্তু বাঙালী সাপুড়েরা জংলী সুরেতে বেহুলার গান করিত ও ডমরু বাজাইত। গানের কিয়দংশ দিতেছি,

"সাতালি পরবতের উপর
লোহার বাসর ঘর
আর তার মাঝেতে শুয়েছিল সোনার লখিন্দর।"

তাদের সুর বড় মিষ্ট ছিল। বেহুলার কথা তখন খুব প্রচলিত ছিল যথা—"নিতি ধোপানি কাপড় কাচে ক্ষারে আর বোলে, বেহুলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গাজলে"—চাঁদ সদাগর বলিতেছে—

"যে হাতে পূজেছি আমি দেবী ভগবতী
সে হাতে পূজিব কিনা কানী চ্যাঙ্গবুড়ী।"

তখন বেহুলার ছড়া সকলের মুখে শুনা যাইত। কিন্তু প্রাচীন গ্রাম্য ভাষায় সেই ছড়া বড় মিষ্ট ছিল। আধুনিক পরিমার্জিত কথায় বলিলে তাহার মিষ্টতা থাকে না।

তখন দেখিতাম অনেক প্রকার সাপ মালেরা দেখাইতে আনিত। এখন আর তত রকম দেখিতে পাওয়া যায় না এবং কলিকাতায় সাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বিবাহের খাস গেলাস

আগে বিবাহ উপলক্ষে বরের শোভাযাত্রা কালে খাস গেলাসের ঝাড় হইত। মাটির ছোট ছোট মোমবাতি রাখিবার এক রকম বাতিদান হইত অর্থাৎ মাটির একটা খুরি করে তার মাঝখান থেকে উপর নীচে দুটো এক ইঞ্চি করে চোঙ্গা থাকিত। অভ্রের গেলাস করে লাল কাগজের পাড় দিয়া গেলাসটার উপর দিক ও নিচের দিক জুড়িতে হইত, দেখিতে একটু বাহারী হইত এবং আলগা অভ্রটাও পড়িয়া যাইত না। সেই অভ্রের গেলাসটা খুরির উপর আঠা দিয়ে বসান হইত। আর তার ভিতর একটি মোমবাতি থাকিত এবং এই মাটির খুরিটা একটা বাখারির ডাল বা ডাণ্ডার উপরে আটকান হইত। এইরূপে আটটা দশটা ডাল

দিয়ে একটা ঝাড় হইত। একটি বাঁশের লম্বা ডাণ্ডা থাকিত এবং তার গায়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এই বাঁখারির ডাল হইত, তাতে দশ বারটি খাস গেলাস থাকিত। প্রথম প্রথম দেখিয়াছি মোমের বাতির প্রচলন ছিল, চর্বির বাতি তত নয়। কিন্তু অল্প দিনের ভিতর মোমের বাতি দুষ্প্রাপ্য হইল এবং চর্বির বাতি চলিল। সমারোহপূর্ণ বিবাহেতে এই খাস গেলাসের ঝাড় লইয়া বরের শোভাযাত্রা হইত।

বাঁধা রোশনাই

কখনও কখনও বড় মানুষেরা বাঁধা রোশনাই করিত। অর্থাৎ বাটী হইতে কনের বাড়ী পর্যন্ত যে রাস্তা পড়িবে সেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে এই খাস গেলাসের ঝাড় পুঁতিয়া দিয়া যাইত। সাধারণ শোভাযাত্রায় খাস গেলাসের ঝাড় যেমন বরের সহিত হাতে করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা, বাঁধা রোশনাই-এতে তাহা করিতে হইত না।

তখন বর চতুর্দ্দোলা করিয়া যাইত। কাঠের একটা ঠাকুর দালান করিয়া তাহাতে পিতলের পাত মুড়িয়া রূপালি হলকরা করিত। মধ্যবিত্ত লোকেরা সুখাসন বা তাঞ্জামে যাইত। উড়িষ্যা দেশেতে এইরূপ তাঞ্জাম এখনও দেখা যায়। একটা লম্বা বাঁশকে বক্রভাব করিয়াছে—দুই ভগা সিধে এবং মাঝখানটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায়। বাঁশের এই অর্ধচন্দ্রের উপর বসিবার হাওদার মত একটা কাঠের ফ্রেম থাকিত যেন একটা সোফা কৌচ এবং নিচে পা ঝুলান যাইতে পারে বা একখানা ফিটিং গাড়ি কোচোয়ানের অংশ বাদ দেওয়া। এই আসন নানা রকম সাজিয়ে সামনে পিছনে মেটাকে কাঁধে করিত। এরূপ যানকে সুখাসন বা তাঞ্জাম বলিত। ইহা অনেক প্রকারের হইত। গ্রামদেশে তখন তাঞ্জামের প্রথা খুব প্রচলন ছিল।

কনে যাইবার জন্য মহাপায়া থাকিত অর্থাৎ একটা ভাল রকমের ডুলি হইত। কনে ও তাহার সম্মুখে ঝি বসিত এবং মাঙ্গলিক বস্তু তাহাতে থাকিত। সেটা নানা রকম করে সাজান হইত এবং লাল মখ্‌মলের জরির কাজ করা উপরে একটা ঘেরাটোপ—কনের যান এই ছিল। পুরীতে বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রার সময় বিগ্রহকে যে প্রকার ডুলি করিয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহাকেই এদেশে মহাপায়া বলে। পুরীতে এই তাঞ্জাম ও মহাপায়া এখনও প্রচলিত আছে।

বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রথা

শৈশবে আমরা দেখিতাম যে বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার একটি মহা হাঙ্গামার ছিল। বৃদ্ধাদের কাছে শুনিয়াছি, এমন কি আমার মাতৃকুলের এক পূর্বপুরুষের বিবাহে বরের হাতে একটি খেলনা দিয়াছিল এবং মেয়েকে কুলোয় করে শুইয়ে দিলে, বর আর কনের বাপ মন্ত্র পড়িল। এখন আইন হিসাবে কার সঙ্গে কার বিবাহ হ'ল উকিলরা নির্দেশ করুক। তখনকার দিনে পিঁড়েতে বা কুলোতে ছোট ছেলেদের শুয়াইত, কথায় বলিত কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খাওয়াবে। যাহা হউক আমাদের শৈশবে কুলোয় শুয়ানো প্রথা ভদ্রলোকের ভিতর কমিয়া গিয়াছিল। আমাদের দু-এক পুরুষ আগে বোধ হইতেছে মেয়ের সংখ্যা কম হইত এবং ছেলের সংখ্যা বেশী হইত। সেইজন্য কথা ছিল, "কনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে" কিন্তু এখন হইয়াছে "বরের বাপ হাঁসে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে" অর্থাৎ কয়েক পুরুষের মধ্যে দেশের জলবায়ু এত খারাপ হইল এবং আহার সামগ্রী কমিয়া গেল এবং সেইজন্যে ছেলে হইতে মেয়ে বেশী হইল। এটা সব দেশেই হইয়াছে। এখন বাগ্‌দী দুলেদের ভিতর ছেলের সংখ্যা বেশী এবং মেয়ের সংখ্যা কম। অসভ্য যাযাবরদের ভিতরও ছেলে বেশী এবং মেয়ে কম।

তখনকার দিনে কায়স্থ ব্রাহ্মণদের ভিতর প্রথা ছিল কুল করা অর্থাৎ মেয়েকে এক কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া বাড়ীতে পোষা। এই কুল করা প্রথা যে কি গর্হিত ছিল, যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা জানেন। পাঁচ ছয় পুরুষ এই বংশকে প্রতিপালন করিতে হইত। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে উপযুক্ত বর না পাইলে মেয়ের বিবাহ দিত না। অনূঢ়া থাকা সেও ভাল কিন্তু কুল ভঙ্গ করে বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তখনকার দিনে কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে অনূঢ়া বুড়ী দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু কায়স্থের ঘরে যে কোন প্রকারে মেয়ে পার করিতে হইত। এখন কায়স্থের ভিতর কুলীনের সহিত মৌলিক ছাড়া বিবাহ হয় না, কুলীনে কুলীনে বিবাহ হয়। কিন্তু পূর্বে এই কলিকাতাতে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ হইত। যথা আমার এক পূর্বপুরুষ এই ছাতুবাবুর বাজারের পাশে সিংহদের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন সমাজে এসব প্রচলিত ছিল। আমরা সেই প্রপিতামহীর কাছে আগেকার অনেক কথা শুনিতাম। তাঁহারা দীর্ঘজীবি ছিলেন কারণ জল-বাতাস ভাল ছিল এবং আহারও প্রচুর ছিল। এই প্রপিতামহী ছিলেন সিংহদের বাটীর মেয়ে।

আমাদের সময় আট নয় বৎসরের মেয়ের বিবাহ হইত এবং মৌলিকের সহিত কুলীনের ক্রিয়াকলাপ চলিত। মৌলিকে মৌলিকে কলিকাতার ভিতর চলিত না কিন্তু দূর গ্রামে এবং সামান্য ঘরে মৌলিকে মৌলিকে ক্রিয়াকলাপ চলিত এবং এখনও চলে। বিবাহের প্রথম অনুচর হইলেন ঘটক। আমাদের শৈশবে ঘটক হইতে ঘটকীর প্রথা উঠিল। কারণ বাটীর গিন্নীরা বিবাহকার্যে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। প্রথমতঃ ঘটক আসিয়া পাত্র-পাত্রীর কথা স্থির করিত। তারপর পাড়ার বৃদ্ধেরা ঘর বর স্থির করিত অর্থাৎ কোন ঘরের সহিত কোন ঘর বা কোন বংশের

সহিত কোন বংশের বিবাহ হইতে পারে এটা স্থির করা, ইহা বড় জটিল ব্যাপার ছিল। অমুক বংশের এই দোষ, আর অমুক বংশের ঐ দোষ এই নিয়ে ঘোঁট চলিত। এই নদী সাঁতরে পার হ'তে পারলে তবেই বিবাহ। তারপর অলংকার ও দানসামগ্রীর হিসাব। কারণ আমরা শৈশব হইতে দেখিয়াছি মেয়ের সংখ্যা বাড়িল এবং ছেলের সংখ্যা কমিল। এই জন্য ছেলের বাপ কনের বাপের কাছ থেকে কিছু পাইতে আশা করিল। কিন্তু এর ঠিক পূর্বে কনের বাপ কিছু পাইত। ইহাকে পণ বলে।

যাহারা সংগতিপন্ন লোক এবং দুপয়সা খরচ করিতে পারিত তাহারা "সামাজিক" বাহির করিত। অবস্থা অনুযায়ী থালা বা ঘড়া, পিতলের বা তামার। যদি বড় মানুষ হইত রূপার জিনিস। তাহাতে কিছু মিষ্টান্ন কাপড় দিয়া আত্মীয়, কুটুম্ব ও বিশিষ্ট লোক-দের নিমন্ত্রন করিয়া আসিত। কলিকাতায় এ-প্রথা এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামদেশে জমীদারদের ভিতর এ-প্রথা কিছু কিছু আছে। এই হইল বিবাহের প্রথম সূচনা। সন্তান জন্মাইলে সরিষার তেল, গোটা মাষকড়াই এবং একটা বোকনো আত্মীয়-স্বজন ও গণ্যমান্য লোকদের নিকট বিতরণ করিত। কথায় বলিত, "তেল, মাষকড়াই বেরিয়েছে" মানে তাদের বাড়ী একটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় এ-প্রথা দেখি নাই।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই পাড়ার সধবা স্ত্রীলোকেরা আহার করিয়া বিবাহ বাটীতে জটলা করিতে আসিতেন। নানারূপ গল্প হইত, ছড়াকাটান হইত আর কেউ চরকায় সুতা কাটিত, কেউ পিঁড়েতে আলপনা দিত এবং কেউ খুরিতে নানারূপ দ্রব্য সাজাত, কেউ গুঁড়ি কুটে নাড়ু করিত---এইরূপ অনেক ব্যাপার হইত। তখনকার দিনে পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কারণ এক পাড়াতে পুরুষানুক্রমে বসতি করায় একটা সম্পর্ক

হিসাবে সম্বোধন করিত। এখানে জাতি-বর্ণের কোনো কথা নেই। এখন পাড়ায় সব ভাড়াটে বাড়ী হওয়ায় সে ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্বে পাঁচ সাতদিন হইতে পাড়াতে একটা আনন্দ উঠিত। সকলেই মনে করিত যেন তাদের বাটীতেই কাজ এবং কর্তারা আসিয়া যেমন খরচ করিতে পারিবে সেই হিসাবে ফর্দ করিয়া দিত। করা-কর্মানোর ভারটা পাড়ার লোকেরাই লইত।

বিবাহেতে আগে কাঁচা দেখার প্রথা ছিল অর্থাৎ বরের তরফ ও কনের তরফের কর্তারা পরস্পর আসিয়া কথা কহিয়া যাইবে কিন্তু এই দেখার পরও বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারিত। তাহার পর শুভদিনে পাকা দেখা হইত। সেইদিন কনের বাড়ীতে বরপক্ষের লোকেরা আসিত। বেশ রীতিমত সভা করা হইত--উভয়পক্ষের পুরোহিত ও পাড়ার ব্রাহ্মণেরা থাকিত এবং কায়স্থের বাড়ী হইলে জনকতক কুলীনও আসিত সেই বৈঠক-ঘরে রূপা বাঁধান হুঁকা বাহির হইত এবং কলাপাতা একটু একটু ছিঁড়িয়া বৈঠকে রেকাবিতে রাখা হইত। কায়স্থের বাড়ী হইলে ব্রাহ্মণের হুঁকাতে দুটো কড়ি ঝুলানো হইত আর ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কায়স্থের হুঁকাতে দুটো কড়ি ঝুলানো থাকিত। তাহার পর যে যার কলাপাতার নল দিয়া হুঁকা (তামাক) খাইত। তখন নল পাকানো একটা বিদ্যে ছিল। আর বসবার প্রথা হচ্ছে চেপ্‌টানী খেয়ে বসে কোমরটা সম্মুখে এগিয়ে দিত। দেখতে হাড়গোড় ভাঙ্গা "দ"-এর মত হ'তে আর তামাক টানিত। তাহার পর ব্রাহ্মণ বিদায়, কুলীনের কুলমর্যাদা দিয়া শুভ মুহূর্তে পাকাপত্র হইত, অর্থাৎ লাল তুলট কাগজ বা বিলাতী কাগজে বা অন্য কাগজে আলতা গুলে বা অন্য রং করে খাঁকের কলমে উভয়ের নাম, বর্ণ, গোত্র, বংশ ঠিকানা ইত্যাদি লেখা হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরও নাম ঠিকানা লেখা হইত। তারপর একটা নতুন রূপার টাকাতে চন্দন মাখিয়ে সেই পাকা পত্রের মাথার

কাছে শীলমোহর করা হইত এবং ধান, আলতা ও কলাপাতের খিলির ভিতর দূর্বাঘাস দিয়া,—যাহা এখনও ৺দুর্গাপূজার বরণে ব্যবহার হয়—সম্ভবতঃ একটা গিলা দিয়া লাল রেশমের সুতাতে সেই পত্র বাঁধিয়া বরের বাপ কনের বাপকে দিত আর চারদিকে শাঁখ বাজিত ও উলুধ্বনি পড়িত। তারপর অভ্যাগত লোকেরা পরিতোষ হইয়া আহার করিয়া চলিয়া যাইত। পাকাপত্র প্রায় কনের বাটীতে হইত। এখন এ-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে এইমাত্র জানা যায় যে, কোন সময় বিশিষ্ট ঘরে এই সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়াছিল, সেইজন্যে এই লেখাপড়ার প্রথা। পশ্চিম প্রদেশে এই প্রথা নাই।

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ডাকে দিয়া পাঠান হইত না। দূর দেশ হইলে লাল কাগজে হাতে লেখা চিঠি নাপিত দিয়া আসিত। কলিকাতার ভিতর হইলে সরকার অথবা অন্যলোক— কর্তার ছেলে বা ভাই আসিয়া নিমন্ত্রণ করিত। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ীর মেয়েরা পাল্কি করিয়া অপর বাড়ীর মেয়েদের বলিয়া আসিত। তখন নিমন্ত্রণে যাইবে কিনা এই নিয়ে একটা জটলা চলিত। তখন জাত, কুল, মান এই নিয়ে ঝগড়া বাদ-বিসম্বাদ হইত। নিমন্ত্রণ করা ও খাইতে যাওয়া বড় ফেসাদের কাজ। ছেলেবেলায় আমি নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া বড় বিব্রত হইয়াছিলাম।

গায়ে হলুদ মাঙ্গলিক কার্য, ইহা প্রায় তদ্রূপ আছে তবে জিনিসপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম কিছু ভিন্ন হইয়াছে কিন্তু মাঙ্গলিক ব্যাপার সব ঠিক আছে। বিবাহের পূর্বে পাড়া প্রতিবেশীকে আনন্দনাড়ু বিতরণ করার একটা প্রথা ছিল। এক একজন কুড়িটা পঁচিশটা পর্যন্ত খাইত। ধন্য বলি তাদের পেটকে। তখন বিদেশী জানোয়ার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার সহিত বাংলার পরিচয় হয় নাই। এই আনন্দনাড়ু প্রায় সকল কাজে দেওয়া হইত।

লগ্ন হিসাবে বর তো খাসগেলাস বা চতুর্দোলা বা তাঞ্জাম করিয়া আসিত এবং সভায় বরের একটা বিশেষ শয্যা হইত। বর সে-সময়কার রাজা এই জন্য রাজ-সম্মান পাইয়া থাকে। কাশ্মীরে বর-কে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। এটা ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা। এজন্য বয়োজ্যেষ্ঠ মান্যমানীরা থাকিলেও সে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসিবে। তখন লোকজন খাওয়াইতে আলোর আবশ্যক হইলে তেলের সরা করিত। একটা বাঁশকে মাটিতে পুঁতিত তাহার উপরের ডগাটা তিন বা চার ভাগে ফাঁক করিত এবং মাঝে গোঁজা দিয়া সেটাকে ফাঁক করিয়া রাখিত; এই তেকাটার মাথায় একটা বড় সরা দিত। সেই সরাতে একটা ন্যাকড়ায় সরিষা বাঁধিয়া রাখিত; সেই সরিষার পুঁটলির উপর খুব তেল ঢালা হইত। আর সরিষার পুঁটলির গাঁটের কাছে ডগাতে আগুন দিত। তাহাতে বড় মশালের মত আলো হইত কিন্তু যখন সরিষা পুড়িত তখন চিমষা গন্ধ বাহির হইত।

তাহার পর বিবাহের যেমন অনুষ্ঠান আছে তাহা পুরোহিত করিত। বর তারপর ছাঁদনাতলায় গেল। ইহাকে বলে স্ত্রী-আচার, অনেকেই মনে করেন এইগুলো স্ত্রীলোকের কার্য এবং এ-সকল ক্রিয়ার কোনো প্রমাণ নেই। যাহাকে চলিত কথায় আমরা স্ত্রী-আচার বলি ইহার অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায় যথা—শিলের উপর দণ্ডায়মান; ইহার মন্ত্র হইতেছে, এই শিলা যেমন স্থির ও অচল, তোমার চিত্ত আমার উপর স্থির ও অচল থাকুক, এইরূপ পরস্পর বলিবে। গোভিল, অশ্বলায়ন, পারুস্কর, খাদীর প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রে অনেক উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং গর্ভিণী অষ্টম বা নবম মাসে রাত্রে পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া একটি ডাব খাইয়া চলিয়া যাইবে—ইহা চান্দ্রায়ণ ব্রতের ভিতর দেখিলাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ দেখিলাম। স্ত্রী-আচার একটা জাতির বিশেষ করিয়া

শিক্ষণীয়। কারণ এই সকল হইতেছে অতি প্রাচীন প্রথা। সেই জাতির অন্তর্নিহিত প্রাণস্বরূপ ইহাতে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্ত্রী-আচার বুঝিতে হইলে গৃহ্যসূত্র সকল বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। দেখিলাম হিন্দুজাতির এত পরিবর্তন হইয়াছে। বাহ্যত দেখিলে প্রাচীন যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছে। কিন্তু গৃহ্যসূত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় হিন্দুজাতি একই আছে। এই গৃহ্যসূত্রের কেহই পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। যাহারা Research scholar তাহারা এই গৃহ্যসূত্র বিশেষভাবে পড়িবেন এবং স্ত্রী-আচার লক্ষ্য করিবেন।

মালা-চন্দন ও ভাট বিদায়

আগেকার দিনে বিবাহে মালা-চন্দনের প্রথা ছিল অর্থাৎ চন্দন ও মালা লইয়া মালী উপস্থিত থাকিবে এবং কর্মকর্তা ও অপর সকলকে, শ্রেষ্ঠ কুলীন অনুযায়ী, গলায় মালা ও চন্দন পরাইয়া দিবে। অবশ্য ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যির কথা স্বতন্ত্র তাহারা প্রণামী হিসাবে মালা পাইবে। এই মালা-চন্দন করিলে শ্রেষ্ঠ কুলীন ও মুখ্যি কুলীনকে ধুতি চাদর ও বিদায় দেওয়া হইত। তাহার পর অনুমতি লইয়া বিবাহকার্য আরম্ভ হইত। তখনকার দিনে কুলীনের ভিতর যে কত রকম ভাগ ছিল তাহা আর কি বলব, যথা—মুখ্যি, মধ্যাংশ ও আরও অনেক রকম নাম ছিল। এক্ষণে অপ্রচলিত কারণ কুলীনগিরি তখন একটা ব্যবসা ছিল।

তখনকার দিনে প্রত্যেক সমারোহ ব্যাপারেও ভাট আসিয়া উপস্থিত হইত। ভাট আসিয়া প্রত্যেক বংশের নাম দোষগুণ বর্ণনা করিত অর্থাৎ কুলজি আওড়াইত। লোকে ভয়ে ভয়ে ভাটকে সন্তুষ্ট করিত এবং ভালোরকম দক্ষিণা দিত। কারণ তাহা না হইলে ভাটঠাকুর খাতায় বদনাম লিখিয়া দিবে এবং কিছু পাইলেই

সুখ্যাতি লিখিবে। তখনকার দিনে কুলীনগিরি ও ভাট বিদায় মহা উৎপাতের ব্যাপার ছিল। এখন কলিকাতায় এসব উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু পূর্ববঙ্গে এখনও ভাট বিদায় আছে।

লোক খাওয়ানো

আমাদের শৈশবের পূর্বে কি রকম লোক খাওয়ান হইত বলিতে পারি না, কারণ আগে ময়দার প্রচলন ছিল না এবং দেখিতেছি এখনও কলিকাতার পুরান কালীবাড়ীতে রাত্রে অন্নভোগ হইয়া থাকে। লুচির কোন বন্দোবস্ত থাকে না। সেইজন্য মনে হয় আগে বোধহয় রাত্রে বিবাহে ফলাহার হইত অর্থাৎ চিড়ে, দৈ, ঘি ইত্যাদি। এটা অনুমান করি, কারণ ছেলেবেলায় আমরা বলিতাম জলপানের নিমন্ত্রণ; লুচির নিমন্ত্রণ একথা ব্যবহার করিতাম না। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি যে লুচির ব্যবহার বে-র রাত্রে, কিন্তু কাজে ভাতের ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে কলাপাতায় বড় বড় লুচি দিত আর আলুনী কুমড়ার ছক্কা; বড় সুন্দর হইত এবং কলাপাতের এক কোণে একটু নুন দিত। সে রান্নাটা এখনও বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। সে রকম রান্নার পাকা হাত আর নেই। এখনকার কুমড়ার ঘণ্ট যেন রাবিশ। যাঁহারা সেই আলুনী কুমড়ার ছক্কা খাইয়াছেন তাঁহারা জানেন. তাহার পর খুরি সরা বাহির হইত অর্থাৎ কচুরি, যাহাকে কর্মবাড়ীর কচুরি বলিত, বাজারের নয়। সেটা উঠে গেছে। কড়াইডালের পুরে আদা মৌরী দিয়ে কচুরি, নিম্‌কি, খাজা, চৌকা গজা, মতিচুর এইসব সরাতে থাকিত। খাজা তখন খাবারের ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল আর খুরি করে চার রকমের সন্দেশ থাকিত (তিন রকম ব্যবহার হইত না)। তাহার পর

ক্ষীর, দৈ বাহির হইত। তখন রাবড়ি উঠে নি। রাবড়ির প্রচলন লক্ষ্ণৌতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে কলিকাতায় আসিয়াছে। রসগোল্লা, তিলকুট তখনও হয় নাই। ১৮৭৩ বা ১৮৭৪ সালে প্রথম রসগোল্লা হয় এবং তিলকুটও সেই সময়কার। আমসন্দেশ, কামরাঙ্গা সন্দেশও প্রায় ঐ সময়েই হয়। আগে ছিল আতা সন্দেশ ও মণ্ডা এবং পেনেটির গুপো সন্দেশ বড় বিখ্যাত ছিল। সেটা দেখতে ছিল দুখানা ফেণী বাতাসা একসঙ্গে জোড় করার মত। তখনকার দিনে গুপো সন্দেশের খুব নাম ছিল, এখন উহা উঠিয়া গিয়াছে। তখন গরুর দুধের ছানায় সন্দেশ হইত। দুধে ভেজাল দেওয়া বা মাটা তোলা হইত না। তাহার পর ক্ষীর ও দৈ বাহির হইত। খাজা দিয়ে ক্ষীর খাওয়া হইত। ইহাকে ক্ষীর-খাজা বলিত।

ক্রমে ক্রমে শাক ভাজার আবির্ভাব হইল পরে পটল ভাজা বাহির হইল। এই পর্যন্ত হইয়াই গতিরোধ হইল। আর বিশেষ উন্নতি হইল না। তারপর হঠাৎ ইংরাজী পড়ার ঠেলায় নুন দেওয়া ছোলার ডাল বাহির হইলেন এবং নুন দেওয়া আলুর দম প্রকাশ পাইলেন এবং আলুনী ঠাণ্ডামূর্তি কুমড়ার ছক্কা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, তিনি আর ভদ্রলোকের পাতে প্রকাশ পাইতেন না। ক্রমে ক্রমে পাঁপড়, সিঙ্গাড়া প্রকাশ পাইল এবং সরা সাজান লোপ পাইল এবং দু-একটা মিষ্টি ও গুঁজিয়াতে পর্যবসিত হইল। কিন্তু কর্মবাড়ীতে মাছের তরকারী লইয়া এক সমস্যা উঠিল।

আমরা একবার রাত্রে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপনয়নের নিমন্ত্রনে গেছি। তখন নুন দেওয়া তরকারী খাবার প্রচলন হইয়াছে। হঠাৎ মালসা খুরি হাতে মাছের তরকারীর আবির্ভাবে সকলেই হাঁ হাঁ, কি করেন জাত গেল, ধর্ম গেল। বোধ হইল সকালেই সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই তো কটা বুড়োয় রব তুললে। আমরা ছোকরার দল লোলুপ দৃষ্টিতে মালসার দিকে আর পাতের দিকে

চাহিতে লাগিলাম, যদি মা কালীর কৃপায় লুচিতে আর মাছেতে সংযোগ হয় ত সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তখনই পাই। এমন সময় আমাদের দিকে একটা বুদ্ধিমান লোক বললে, "কি জান, আমরা কায়স্থ, তা ব্রাহ্মণের পাতের এঁটো খেলেও জাত যায় না, ব্রাহ্মণের বাটীতে মাছের তরকারী প্রসাদের সামিল কাজেই সেটা রাত্রে বা দিনে সব সময়েই খাওয়া যেতে পারে"—এইসব স্মৃতির বচন সে আওড়াইল। তখন "আমাকে দাও" "আমাকে দাও" করে গামলা ফুরিয়ে গেল। আবার আনতে গেল। পরদিন সকালে খুব ঘোঁট হ'ল। আমরা খেয়েছিলাম তাই মহাদোষী, সকলেরই হয়ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বিশেষ বাড়াবাড়ি হল না কারণ আমরা বুড়োদের মানতে নারাজ। এই রকম করে আলুনী কুমড়ার ঘণ্ট থেকে নানা রকম তরকারী হইল।

কিন্তু কায়স্থের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যি খাইলে অনেকে দেখেছি লুচি চিনি খাইত বা শুধু মিষ্টি খাইত। আলুনী তরকারীও খাইত না। ওটা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

বাসরঘর

তখনকার দিনে বাসরঘর এক শাস্তির ঘর ছিল। পাড়ার সব মেয়েরা সেখানে থাকিবে; শ্বাশুড়ি সম্পর্কে যাহারা তাহারা থাকিবে না কিন্তু দিদিশ্বাশুড়ি ও শালীরা থাকিবে। প্রথমে শালীরা আসিয়া কনেকে হুকুম করিবে বরের কান ধরিয়া উঠ্‌বোস করা। আর সেই সময় একটা গালের কথা বলিত—উঠ···ইত্যাদি। সেই সাতবার তো কানমলা হল। বর বাবাজী বুঝিলেন কি ঝকমারী করেছি, কানমলা খেতে খেতে প্রাণ গেল। তাহার পর ছড়া কাটানো। পাড়ার এক একটা বুড়ী বড় ছড়া কাটিতে পারিত। প্রত্যেক কথায় তারা ছড়া

কাটিতে পারিত। এসব ছড়াতে খুব কবিত্ব শক্তি ছিল। যদি কেহ এই বাসরঘরের ছড়া সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হইতেছিল। ছড়া ও হেঁয়ালির দেউড় উঠিত। কতকগুলি মেয়ে আর বুড়ী মিলে ছড়া কাটত, যেন মুখে খৈ ফুটত আর তারপর আবার হেঁয়ালি। এই প্রশ্নটা বরকে সকলে করিত, "রাম সীতাকে বে করেছিল জনকের মেয়ে, আর জনক মানে ত বাপ, তা তোমার বেটা কি রকম হল বর?" এইসব ছড়া কাটিয়ে রাত্রি কাবার করত। তাহার পর ছিল সেঁজতোলানি। শয্যাতোলানির দরুণ বরের বাপের কাছ হইতে পাড়ার মেয়েরা টাকা পাইত। সেঁজতোলানি না দিলে বরকে নিয়ে যেতে দিত না। এটা ছিল পাড়ার মেয়েদের আমোদ। আট টাকা হোক দশ টাকা হোক, পাড়ার মেয়েরা এটা ভারী আহ্লাদ করিয়া লইত। তারপর বাসী বিবাহ হইত। ইহাতে পুরুতের কোন আবশ্যক ছিল না, মেয়েরাই স্ত্রী-আচার করিত। ইহা সমস্ত গৃহ্যসূত্র অনুসারে হইয়া থাকে কিন্তু মন্ত্রগুলি ও উদ্দেশ্যগুলি জানে না, প্রথা অনুযায়ী করিয়া যায়। এইগুলিকে স্ত্রী-আচার বলিয়া সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকে; ইহার অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে আছে এবং অতি প্রাচীন প্রথা। বিবাহাদি সমস্ত কার্য, জলসওয়া, ঘরমোগলান ইত্যাদি সকল কার্য স্ত্রী-আচার বলিয়া গণ্য হয়। এইগুলি অনেক গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায় এবং ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টির শুভমিলনের সময় দাঁড়িয়ে যে গাল শুনা যায় ওটা বৃদ্ধ ব্রহ্মার কাজ ছিল এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বোধহয় আর্যজাতির প্রথম অবস্থা হইতে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি চলিতেছে। তাহার পর ছিল কনে-চন্দন। একটা বাটি করে চন্দন ঘসে ও একটা খড়কে নিয়ে মুখে চন্দন পরানো আরম্ভ হ'ল। তা সে চন্দন-শিল্প-নৈপুণ্য দেখান মানে নিছক ছুটো কৃষ্ণের জীবকে মেরে ফেলা। এই হইল শুভ বিবাহ প্রকরণ।

দান সামগ্রী

দান সামগ্রী আগে এত ছিল না। অল্প পরিমাণে ছিল তবে দুটো বিশেষত্ব ছিল। সেটা এই—একজোড়া হাতীর দাঁতের বোগলওলা খড়ম দিতে হ'ত আর পানের বাটা দিতে হ'ত। বাটাটা হচ্ছে একটা রেকাবি উল্টে দিলে বেশ মুখে মুখে পড়ে এবং তার মাঝে অনেক-গুলো বাটি। ডিবেতে পান সেজে দেওয়ার প্রথা ছিল না। তখনকার ছড়া ছিল "চাঁদ মামা চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যেও, বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।" আর একটা ছড়া ছিল "খোকা বড় বাবু, ঘোড়ার উপর চাবু, ডুগডুগি বাজাবু, পাকা পান খাবু।" তখনকার দিনে পানের বাটার বাটিগুলিতে চুন, খয়ের ও নানা রকম মশলা দেওয়া হইত এবং পাকা পানের শিব ফেলে ভাঁজ করে মাঝখানে থাকিত। গোটাকতক পানের বোঁটা থাকিত। সেই চেরা পানে বোঁটা করে চুন দিয়ে ইচ্ছামত যে যার সেজে খেত। আর পানের মশলা ছিল জায়ফল, জয়িত্রী, কর্পূর। তখন ছোট এলাচকে গুজরাটী এলাচ বলিত। বড় দামী ছিল বোধহয় গুজরাট হইতে আসিত বলিয়াই ইহাকে গুজরাটী এলাচ বলিত। বড় এলাচ ছিল বড় সস্তা। তখন জায়ফল, জায়ত্রীর ব্যবহার খুব বেশী ছিল। কাঁচ পান তখন কেহ ব্যবহার করিত না, এইজন্য পাকা পানের সুখ্যাতি ছিল। তখন মেদিনীপুর হইতে অনেক রকম পান আসিত—কর্পূর কাটা, জোয়ান কাটা ইত্যাদি, এখন আর সে সব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন ডিবের প্রচলন হইয়াছে বাটার পান উঠিয়া গিয়াছে। এখনকার মতন বিবাহতে সাবানের বাক্স ও বিলাতী সুগন্ধ দেওয়া হইত না।

গ্রামভাঁটি

বরকর্তা পাড়ার ছেলেদের খাওয়াইবার জন্য গ্রামভাঁটি দিত। যেমন সেঁজতোলানিটা পাড়ার মেয়েরা পায়, তেমন গ্রামভাঁটি পাড়ার ছেলেরা পায়। তিন চারটি গ্রামভাঁটি একত্র হইলে একটা খাওয়া হইত। তাহার পর কাঙালী বিদায় ও অন্যান্য কিছু কিছু দিয়া বর কনে বিদায় লইত।

গ্রামভাঁটি শব্দটার অর্থটা অনুমান করা যায় যে, পাড়ার ছেলেদের ভাঁটি বা মদ খাইবার জন্য কিছু দেওয়া হইত। শব্দটার মানে এইরূপ বোধহয় যে, ভাট শব্দ হইতে এটা হয় নাই। যেমন যাত্রা ও বাইনাচ দেখিতে "পেলা" দিতে হয় অর্থাৎ "পিয়ালা" অর্থাৎ একবাটি মদের দাম দেওয়া হয়। ইংরাজী বকসিসকে Tips বলে। ইহার উৎপত্তি এই প্রকার।

উলুধ্বনি

একটা বিশেষ কথা এই যে, এই দেশে যেটা উলুধ্বনি পূর্ববঙ্গে সেটাকে জোকার বলে অর্থাৎ জিহ্বা দ্রুতবেগে সঞ্চালন করিয়া তীক্ষ্ণ স্বর নির্গত করা। এটা বাংলাদেশের বিশেষত্ব দেখিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথা আছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না, বোধহয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আমি যখন মিশরদেশে কায়রো নগরে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন মহামন অর্থাৎ মক্কাতীর্থ করিবার সময় যাত্রীরা সমবেত হইয়া শুভদিনে শুভমুহূর্তে যখন যাত্রা করিবে, তখন সকলে রাস্তায় সমবেত হইলে মোল্লারা স্বস্তি বাণী উচ্চারণ করিয়া আশীর্বাদ করিল। সেই সময় উপরকার বারান্দা হইতে কাঠের বিঁধ করা জাফ্রীর ভিতর থেকে মেয়েরা ঠিক এরূপ উলুধ্বনি দিল। বারান্দার

উপরে ঐরূপ শব্দ হইল। আমি শুনিয়া অবাক। এইরূপ উলুধ্বনি আমি আর কোন দেশে শুনি নাই। কায়রো নগরে মুসলমান রমণীদের ভিতর এইরূপ প্রথা কিরূপে হইল তাহা আমি কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু উভয় দেশেই দেখিলাম যে মঙ্গলকার্যে উলুধ্বনি হইতেছে।

অপর একটি প্রথা কায়রোতে দেখিলাম। বারান্দায় কাঠের তক্তার মধ্যে নানা প্রকার ছিদ্র করিয়া জাফ্‌রী করিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া আলো ও হাওয়া যায় এবং স্ত্রীলোকেরা বাহিরের সকলকে দেখিতে পায় কিন্তু বাহিরের কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। আমাদের কলিকাতায় সদর বাড়ী ও অন্দর বাড়ীর ভিতর যে জানলা পড়ে তাহাতে এইরূপ কাঠের জাফ্‌রী থাকিত। তখন কাঠের জাফ্‌রীর খুব প্রচলন ছিল, ঝিলমিল প্রথা উঠে নাই। শাঁক বাজানোর প্রথা শুধু বাংলাদেশেই, অন্যত্র আমি বিশেষ লক্ষ্য করি নাই।

বরের কনে লইয়া যাওয়া

বর যেমন চতুর্দোলা বা অন্যবিধ যান করিয়া আসিয়াছে সেইভাবে চলিল, কন্যা পিছু পিছু চলিল। চতুর্দোলায় ঘেরাটোপ থাকায় গরম হইত। এইজন্য ঘেরাটোপ একটু তুলে দুপাশে দুজন ঝি পাখার বাতাস করিতে করিতে যাইত। যাহা হউক এখন সে সব আর নেই। ঘেরাটোপে ঢুকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরার দরকার নেই। এখন খোলা মটরগাড়ীতে যেতে পার ইতি রঘুনন্দ স্মৃতি নব্যটীকা। বর কনে বিদায় হবার সময় কাঙালীদের পয়সা কড়ি কিছু দিত, তখন তাহারা রাম সীতার নাম করিত অর্থাৎ রাম এবং সীতার পরস্পর যেমন ভালবাসা ছিল বর এবং কনের ভিতর পরস্পর যেন সে-রকমটা হয়। ভাট বিদায়, গ্রামভাঁটি, বারোয়ারী এসব ত পূর্বেই দেওয়া

হয়েছে। কনে প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে আসিলেই দুধ উৎলান হইত অর্থাৎ ভাঁড়ে একটু দুধ নিয়ে প্যাঁকাটির জ্বালে উৎলান হইত। একটা বা দুটো ল্যাঠা মাছ জলে ছাড়িয়া দিত ইহাকে মেয়েলী ভাষায় মোনামুনী ছাড়া বলে। ভদ্রভাষায় মৎস্য-মোচন বলে। বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির সময় এইরূপ দুটি জীবিত মাছ জলে ছাড়া হয়। ইহাকে মৎস্য-মোচন বলে। এই বিবাহ ও জন্মতিথিতে মৎস্য-মোচন এক প্রথা অর্থাৎ জীবিত দুটি প্রাণীকে জলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এইরূপ অনুমান হয় যে পূর্বকালে যখন গোলাম প্রথা ছিল তখন প্রত্যেক শুভকার্যে গোলাম দম্পতি ছাড়িয়া দেওয়া হ'ত। কারণ দেখিতেছি যে ইংরাজদের Saxon period-এ যখন নর্মানরা রাজা আর Saxon-রা গোলাম তখন কোন বড়লোক মরিবার সময়, পুরোহিত আসিয়া গুটিকতক গোলামের মুক্তি দেওয়াইয়া দিত। ইহাকে manumission বলে। এই যে মৎস্য-মোচন, অনুমান হয় যে ইহা গোলাম মুক্তি দেওয়ার প্রথা হইতে উঠিয়াছে। এইজন্য বলিতেছি যে, আমরা প্রাচীন জাতি আমাদের বিবাহাদির প্রত্যেক কাজে কোনটি কেন হইতেছে তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক এবং নিজেদের ইতিহাস ও অপর জাতির ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া লইলে অনেক তত্ত্বকথা বাহির হয়।

বৌভাত, ফুলশয্যা

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব হইতে মেয়েরা ফুলঝাড় ও নানা রকম জিনিস তৈয়ারী করিত। ইহাকে মেয়েরা শিল্পী কাজ বা শিল্প কর্ম বলিত। কেহ বা ধোয়া ফরসা ন্যাকড়া দিয়ে ফুলঝাড় মালা এমন করিত যে তাহার শিল্পী কাজের খুব নাম হইত। আর এক রকম ছিল যে একটি চেঁচাড়ি কাঠি দাঁড় করিয়ে একটা পানের শির

চিরে আট অংশ করিত। বোঁটা এক থাকিত ও আট ফুলযুক্ত পানের খিলি সাজিয়া সেই বোঁটাটি দাঁড়ান চেঁচাড়িতে বাঁধিয়া দিত। এইরূপে পানের গাছ করিত। পাড়ার মেয়েরা এই শিল্প কাজের জন্য, বিশেষতঃ কনের সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী, পনেরো দিন ধরিয়া মেহনত করিত। কিন্তু এখনকার মেয়েরা সেসব কাজ জানে না। এখনকার মেয়েরা যদিও গান করিতে জানে কিন্তু তখনকার মেয়েরাও বেশ গান করিতে পারিত, তবে তাদের সুরটি পুরান যাত্রাদলের মত হইত।

বিবাহটা ছিল পাড়ার সকল লোকের আমোদ। এইজন্য ফুলশয্যা আসিলে পাড়ার সকল লোক আসিত ও আমোদ করিত এবং সকলেই তা থেকে একটু একটু মিষ্টিমুখ করিত। বাকী ফুলশয্যার যা খাওয়ার দাওয়ান তা এখনও আছে। বিবাহের পর জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলকে ডাকিয়া বৌভাত হইত। ইহা দিবাভাগে হইত। ইহাকে ভদ্র ভাষায় পাকস্পর্শ বলে অর্থাৎ নববধূ আসিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া কুটুম্ববর্গকে খাওয়াইল এবং আগন্তুক সকল ব্যক্তি নববধূকে নিজের জাতি এবং শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিল, এইটাই হইতেছে উদ্দেশ্য। ইহা তখনকার দিনে দিনের বেলায় হইত ও ভাতের ব্যাপার ছিল। এখন রাত্রিবেলায় লুচি মণ্ডার ব্যাপার। এই পাকস্পর্শের কথা অনেক পুস্তকে পাওয়া যায় তবে এটা বাংলার ব্যাপার। পারস্যদেশে বিবাহের পর পোলাও খাওয়ান বলে থাকে। সেটা আমাদের বৌভাতের সমান, আমি ইস্পাহানে অবস্থান কালে এইটা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মন্ত্রপড়ান অংশ ত্যাগ করিলে পারস্য জাতির বিবাহের আনুষঙ্গিক অনেকটা আমাদের সঙ্গে মেলে। আর্যজাতির সাধারণ লক্ষণগুলির সব মিল আছে, পাকা দেখা—শিরীন খোরদান—অর্থাৎ কনের বাপ বরের বাপের চাপ্‌কানের কোঁচড়ে এক কুঁদো মিছরী দিলে এই হল মিষ্টিমুখ করান।

বর যখন প্রথম জোড়ে আসিত তখন পাড়ার লোককে খাওয়াইত। এটা একটা আমোদ ছিল।

গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া

পূর্ব কয়েক পৃষ্ঠায় অনেক বিষয় বলা হইয়াছে; অনেক বিষয় প্রাচীন গ্রন্থ ও আচার সম্বলিত। এইজন্য এখন কলিকাতার পুরাতন আচার পদ্ধতির বিষয় পুনরায় বলিতে ইচ্ছা করিলাম।

আমাদের বাল্যকালে দেখিতাম যে কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া একটা বড় আবশ্যকীয় ব্যাপার ছিল। যদি কেহ মন্ত্র লইতে অনিচ্ছুক হইত বা বয়স একটু বেশী হইয়া যাইত তাহা হইলে মহা ব্যাপার হইয়া যাইত কুলগুরু অনেক সময় দেখা যাইত একটা মাতাল হতচ্ছাড়া লোক। রাস্তায় দেখা হইলে মুখ ফিরিয়া চলিয়া যাওয়ার আবশ্যক কিন্তু সমাজের তখন এমন কড়াকড়ি নিয়ম যে সেই হতচ্ছাড়া লোকের কাছেই মন্ত্র লইতে হইত। আর সমাজে গুরুর মাহাত্ম্য প্রচার করে কতই যে ছড়া হইল যথা—"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" অর্থাৎ আমরা যে সময় জন্মিয়াছিলাম, সেই সময় বাংলা-দেশের সমাজটা একেবারে খুব নীচু অবস্থায় গিয়াছিল। মোটকথা সমাজের মারণিভাটার সময় আমরা জন্মিয়াছিলাম এবং নতুন বাংলা আসিবার প্রথম সূত্রপাত হইতেছিল। আমাদের শৈশবটা হইতেছে বিভক্ত রেখার সমান। পুরানোটাও যাইতে দেখিয়াছি, নতুনটাকেও আসতে দেখিয়াছি।

গুরুঠাকুর বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর কর্তারা কোঁচার কাপড় গলায় দিয়ে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করিত ও বুড়ো আঙ্গুলের ধূলা

লইয়া নিজের জিভে দিত আর অন্তত পাঁচ টাকা রাখিয়া প্রণামী দিত। বাড়ীর ভিতর মেয়েরা আঁচলটি গলায় দিয়া অতি সম্ভ্রমে গুরুঠাকুরকে প্রণাম করিত এবং যাহার যা সাধ্য গুরুঠাকুরের সামনে প্রণামী রাখিত। গুরুঠাকুর বছরে একবার কি দু-বার আসিতেন। তিনি ছিলেন কেবল টেক্সর বিল সরকার। অর্থাৎ খাজনা নিতে আসিতেন। শ্রাদ্ধ-বিবাহাদিতে গুরুঠাকুরের দিব্যি পাওনা হইত। কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলেই ভয় দেখাত যে, সেই বংশে আর কাহাকেও মন্ত্র দিবে না। গুরুঠাকুরের খাওয়া দাওয়ার পরিপাটী ব্যবস্থা হইত, কি রাজভোগই না খাইত! আবার দেখিয়াছি সুবর্ণবণিক, বসাক, তাঁতীদের বাড়ীতে পাল্কি করে গুরুঠাকুর এলেন। ভরভরে মাতাল, কোন রকম করে পাল্কি থেকে নামলেন; আর শিষ্যদের উপর তম্বিতাম্বা, প্রণামীর টাকা দাও, পাল্কি ভাড়া দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুটি তখন সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, টলে টলে পড়ে যাচ্ছেন তারপর বসাক বা তাঁতী শিষ্য, টাকা কড়ি শীঘ্র শীঘ্র দিয়া গুরুর সামনে রাখিতেন। অবশ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাড়ীতে এসব কিছু করিতে পারিতেন না, একটু সংযত হয়ে থাকতেন।

আমাদের কিছু আগেকার সময় বৃদ্ধাদের কাছে শুনিয়াছি যে বর্দ্ধমান অঞ্চলের কুলগুরুর বাড়ীতে পয়সাওয়ালা শিষ্য যাইলে জন-কতক শিষ্যকে পয়সার লোভে মারিয়া ফেলিয়াছিল এবং মৃতদেহের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া দূরে একটি বাঁশঝোপে ফেলিয়া দিয়া আসিল। তখন কোম্পানীর আমল সবে শুরু হইয়াছে, পুলিশের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ডাকাতি করাই একটা উপজীবিকা হইয়াছিল সেইজন্য গুরুজীও ডাকাতি সুরু করিলেন। তারপর যখন ইংরাজ রাজত্ব সুরু হইল, কলিকাতা শহরে শিক্ষিত লোকের মন অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতে লাগিল, তখন কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া হইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিল। অর্থাৎ খৃষ্টান পাদ্রীদের শিক্ষায় ও রামমোহন

রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুত্থানে শিক্ষিত লোকের মাঝে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমাদের শৈশবে অধিকাংশ লোকই কুলগুরুর কাছে মন্ত্র লইত এবং অল্প সংখ্যক লোক লইত না। তাহাতে সামান্য নির্যাতন পাইয়াই অব্যাহতি পাইত। কিন্তু কিছু পূর্বকালে মন্ত্র না লইলে সমাজচ্যুত হইত।

টোপর ও সিঁথিমউড়

টোপর কিরীট বা টায়রা (Tiara) পরা অতি প্রাচীন প্রথা। পুরাকালে পারস্যদেশের রাজাদের মাথায় এই টায়রা থাকিত তাহার বিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের দেশের পুরাতন প্রস্তর মূর্তিতে এই টায়রা বা কিরীট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ধাতু নির্মিত হইত এবং হীরকাদি সংলগ্ন থাকিত। এই হইল প্রাচীন রাজবেশ বা সামরিক বেশ। অবশ্য কিরীট ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে সামান্য সামান্য পৃথক হইয়াছিল। আমাদের বাংলার কিরীট কথাটা সংস্কৃত। কিন্তু টোপর কথাটা প্রাদেশিক। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে স্তূপ, টোপ, এইরূপভাবে মন্দির নির্মিত হইত। বোধহয় এই বৌদ্ধ শব্দ টোপ রূপান্তরিত হইয়া টোপর হইয়াছে। ইহা পণ্ডিতদের বিচার্য বিষয়। সিঁথিমউড়কে ডাইয়াডেম (Dia Dem) বলিত। এসিরিয়ার রাজা বা অন্য অন্য প্রাচীন দেশের রাজাদের প্রস্তর মূর্তিতে দেখিতে পাই যে, সুবর্ণ ও হীরক দিয়া একটা ধুকধুকী (Pendant) করেছে এবং সেইটা সোনা বা অন্য প্রকার জিনিস দিয়া কপালের চারিধারে বেঁধেছে। আমাদের চিক যেরূপ সেইরূপ, তবে সিঁথের উপর যে অংশ থাকে সেটা স্পষ্ট প্রস্তর মূর্তিতে দেখা যায় না। যাহা হউক এই ডাইয়াডেম্ (Dia Dem) রাণীর সাজসজ্জার অলংকারের একটা অঙ্গ ছিল, সেইজন্য কনের মাথায় একটা সিঁথিমউড় দিতে হয়। কিরীট অপভ্রংশ হইয়া কীরে

হইয়াছে যথা—"আমায় যদি করিস বিয়ে করব মাথার কীরে।" রাজপুতানায় মেয়েদের মাথায় শিরোমণি থাকে। কুমারী ও সধবারা ইহা ব্যবহার করিবে, বিধবারা নহে। পাঞ্জাবে বিবাহের সময় মেয়ের মাথায় একটা ছোট্ট সোনার খুরি বা পুরুয়া ভাঁড় বা উল্টান ভাঁড় থাকে। ইহা পুরুয়া ভাঁড় হইতে বড় কুনকে পর্যন্ত হইয়া থাকে, ডোলটা বেশ করে। এই হইতেছে কন্যা সম্প্রদানের একটা বিশেষ অলংকার। এই সিঁথিমউড় বা Dia Dem নানা দেশে নানা ভাবে চলিতেছে। আমাদের সিঁথিমউড় অতি প্রাচীন প্রথা।

জাঁতি

বিবাহকালে বর একটা জাঁতি হাতে করিযা থাকে। জাঁতিকে হিন্দীতে সরোতা বলে। জাঁতি হইতেছে সুপারিকাটার যন্ত্র। কিন্তু জাঁতি হইতেছে একপ্রকার অস্ত্র, দুদিকে ধার, মুখটা ছুঁচালো, দুদিকে দুটো ঠ্যাঙ্ বাহিরে বেরিয়েছে, উভয় দণ্ডের মাঝখানে ধরিবার একটা হাতল আছে, ইহাকে জাঁতি বলে। এটা মহারাণা প্রতাপ সিংহের ছবিতে প্রায় দেখা যায়। আমি উড়িষ্যা দেশে মধ্যবিত্ত জমিদারের ঘরে এই অস্ত্র দেখিয়াছি। বোধ হয় পূর্বে আমাদের বাংলাদেশে এই জাঁতি অস্ত্রের প্রচলন ছিল। এখন ইহা 'সরোতায়' পরিণত হইয়াছে।

শালীদের হাতে নূতন জামাইদের নিগ্রহ

তখনকার দিনে নূতন জামাই প্রথম আসিলে শালীদের হাতে তাহার বিশেষ নিগ্রহ হইত। পাতলা মলমলের চাদর ছিঁড়িয়া তাহাতে ময়দা লাগাইয়া তাহাতে লুচি করিয়া দিত, পিটুলির সন্দেশ—পিটুলি বাটিয়া তাহার দুই ধারে ক্ষীর লাগাইয়া সন্দেশ করিয়া দিত। বোকা নূতন জামাই লুচি ছিঁড়িতে পারিত না, আর সকলে হাসিত। শোলাকে সরু সরু করে চিরে ভাত করিয়া দিত।

আর নূতন জামাই যেমন ভাতে হাত দিতে যাইত, দুই দিক থেকে খুব জোরে বাতাস করিত, শোলার টুকরা ঘরময় ছড়াইয়া পড়িত। আর লোকে ঠাট্টা করিত যে নূতন জামাই সব এঁটো করে দিল। এই শোলার ভাত এমন সুন্দর ভাবে করিত যে দেখিতে ঠিক পেশোয়ারী চালের ভাতের মত হইত। তখন এক রকম উঁচু খুরোওয়ালা রেকাবি ছিল তাহাতে জলখাবার দিত আর খুরোতে একটা কাল সুতা বাঁধিয়া রাখিয়া রাত্রিকালে প্রদীপটা একটু দূরে রাখিয়া জামাইকে খাইতে দিত। আর নূতন জামাই যেমন খাইতে যাইবে অমনি রেকাবিখানা টানিয়া লইত, আর নূতন জামাই-এর হাত মাটিতে পড়িত। অবশ্য এইসব আমোদের পর আসল খাবার, আসল ভাতও দিত। কিন্তু সকলের ইহা একটা দুষ্ট তামাসা ছিল। ডিবের ভিতর আরশুলা পুরিযা পান খাইতে দিত, জামাই যেমন ডিবে খুলিত আর চাবিদিকে আরশুলা ছড়াইয়া পড়িত। সেটা বড় বদ তামাসা ছিল। বৃদ্ধাদেব কাছে শুনিয়াছি অর্থাৎ ঠাকুমা, দিদিমার কাছে শুনিয়াছি যে আগে শালীরা এইরূপ আমোদ করিতে গিয়া দুই তিনটি লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে। একটি গর্ত খুঁড়িয়া একটি পিঁড়ে দিয়া পরে পিঁড়ে টানিয়া লইয়া নূতন জামাইকে সেই গর্ততে ফেলিয়া দুই তিনজনে তাহার গলা টিপিয়া ধরে এবং তাহাতে শ্বাসবন্ধ হইয়া জামাই মরিয়া যায়। তখনকার দিনে নূতন জামাই নিয়ে ঠাট্টা করা পাড়ার মেয়েদের একটা আমোদ ছিল। তখন পাড়ার সব মেয়ে একসঙ্গে মিশিত, এইজন্যে আমোদটা বেশী হইত। ইহাতে বামুন কায়েতে কোন তফাৎ ছিল না।

সিন্দূর-চুপড়ি ও কাজল

তখনকার দিনে শুভকার্যে একটা সিন্দূর-চুপড়ি দিতে হইত। বিবাহ ও দুর্গাপূজায় এটা বিশেষভাবে থাকিত। কথাটা হইতেছে

সিন্দুর এবং চুপড়ি। সধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় সিন্দুর দিত, এই সিন্দুর চুপড়ির ভিতর কাঠের চিরুনি, মাথার ফিতা, দড়ি, পুঁটে, কাজললতা ও কৌটা করিয়া সিন্দুর ইত্যাদি থাকিত। এটা সামান্য ভাবে থাকিত। কাহারও-বা ইহা কড়ি দিয়া সাজান হইত, কাহারও-বা রূপার চারিটি কলস দিয়া হইত। ইহা বাংলাদেশের প্রাচীন প্রথা বলিয়া দেখা যাইতেছে যে, তখনকার দিনে কোন বাক্স ছিল না। চুল বাঁধিবার যাহা কিছু আবশ্যক এই পাত্রটিতে রাখিত এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি করিয়া থাকিত।

চোখে কাজল দেওয়ার প্রথা আগে ছিল। শিশুদের চোখে কাজল দেওয়া অদ্যাপি আছে কিন্তু প্রবীণাদের ভিতর কাজল পরা উঠিয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা ইহাকে সুর্মা বলে। দিল্লীতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কাজল দেয়। কাবুলীদের ভিতর ইহার খুব প্রচলন। সংস্কৃতে ইহাকে অঞ্জন বলে। রামায়ণে "অসিতাপাঙ্গী" শব্দ বহু ব্যবহার হইয়াছে অর্থাৎ চোখের নিচেটা কালো মতন দেখিতে। ইহা একটা সৌন্দর্যের লক্ষণ বলিতেছে। আরবদের হইতেছে Blaek eyed damsel। বোধ হইতেছে, সেইজন্যে প্রথমে চোখে অঞ্জন বা কাজল ব্যবহার হইয়াছিল। তাহার পর ইহা চোখের ঔষধরূপে পরিণত হয়, দিল্লীতে যে সুর্মা বিক্রয় হয় তাহা চোখ ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য।

আগ্রার রাজবাটী দেখিতে গিয়া বেগম মহল দেখিতে লাগিলাম। বেগম মহলে যে সব শোবার ঘর ছিল তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম তাক যেখান থেকে সুরু হইয়াছে সেখানে নীচু দিকে নামান একটা করিয়া হাড়ল রহিয়াছে। প্রত্যেক ঘরে একটি করিয়া হাড়ল। আমি তো জোরে তার ভিতরে হাত দিতে সঙ্গীরা বারণ করিল। দেখিলাম এক ফুট গহেরা (গর্ত)। সঙ্গের যে বৃদ্ধ মুসলমানটি দেখাইতেছিল সে বলিল যে বেগমেরা চুল বাঁধি-

বার দড়ি, ফিতা চুলের ছোট্ বা গুছি ইহার ভিতর রাখিত। চুল বাঁধিবার সময় এখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া চুল বাঁধিত। তখনকার দিনে চুল বাঁধবার জন্যে ফিতা, জরির ফিতা, চুলের ছোট্ বা গুছি থাকিত, কেহ বা সোনার বিছা দিয়া চুল বাঁধিত। ছোট মেয়েরা দুটো সোনার বা রূপার পুঁটে দিত অর্থাৎ ফুলের কুঁড়ির মত মোটা মোটা একজোড়া হইত। সেটা রেশমের দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিত। সেই দুটো খোঁপার গোড়ায় থাকিত। দেখিলাম যে দিল্লীর বেগমদের সিন্দুর চুপড়ি ছিল না। তাহারা নিজ নিজ ঘরের কুলুঙ্গির ভিতর চুল বাঁধিবার জিনিস রাখিয়া দিত। সিন্দুর চুপড়ি ছিল আমাদের সেকালের টয়লেট কেস্ (toilet case)।

চিরুনি ও আরশি

গৃহ্যসূত্রে রহিয়াছে যে আগে সজারুর কাঁটাতে চিরুনি হইত অর্থাৎ সজারুর কাঁটা দিয়া চিরুনি ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। প্রাচীন-কালে এইরূপ হওয়াই সম্ভব। তাহার পর হইতে কাঠ কাটিয়া বিশেষতঃ চন্দনকাঠ কাটিয়া চিরুনি হইল। আগেকার দিনে চন্দন-কাঠের বা হলদে এক রকম কাঠের চিরুনি হইত। বড়লোকদের হাতীর দাঁতের চিরুনি হইত। এখনকার চিরুনি নিতান্তই নূতন। চিরুনিকে আগে কাঁকুই বলিত। কাঁকুই চিরুনি আর সরু চিরুনি। পূর্ববঙ্গে সজারুর কাঁটার চিরুনি এখনও অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাথায় সিন্দুর দেবার প্রথা কবে থেকে চলিতেছে ঠিক বলিতে পারা যায় না। কারণ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ছাড়া অপর দেশে এ প্রথা দেখি নাই। আরসি বা দর্পণ অতি প্রাচীন দ্রব্য, আগে ইহা পিতলের, সোনার বা রূপার হইত। জগন্নাথের মন্দিরে অদ্যাপি পিতলের আরশি। এখনকার আরশি কাঁচের পিঠে পারা লাগান। এই ধাতুর আরশি হইতে ধীরে ধীরে এখনকার আরশিতে আসিয়াছে

কিন্তু মাইকেলের, "সরসী আরশি মোর, তুলি কুবলয়ে অতুল রতন সম পরিতাম কেশে সাজিতাম ফুলসাজে।"

গায়ে মাখিবার চূর্ণ

তখনকার দিনে সাবান ছিল না। কিন্তু গায়ে মাখিবার অনেক চূর্ণ ছিল। দুধ ময়দা দিয়ে, ব্যাসন দিয়ে গা মলা আর অনেক রকম সুগন্ধি গুঁড়ো ছিল তাতে চামড়া পরিষ্কার হইত, শরীর স্নিগ্ধ হইত আর চামড়া চকচকে হইত। সাবানে চুন সোডা আছে, চামড়াটা খসখসে করে দেয়। এইসব চূর্ণ বেশ ভাল ছিল।

লট্‌কান্ বা মেহেদী পাতা

তখনকার দিনে ছোট মেয়েরা হাতে লট্‌কান্ মাখিত। ইহা এক রকম শুকনা ফল, গায়ে রোঁয়া আছে, ভেতরে বীচিগুলো বাজে। খোসা ফেলে বীচিগুলো একটা বাটিতে গুলিতে হইত। তখনকার দিনে লট্‌কানের খুব প্রচলন ছিল। পাতলা ক্ষীরে একটু লট্‌কান্ দিত, লট্‌কান্ দিয়ে কাপড় ছোপান হইত এবং ছোট মেয়েরা হাতে মাখিত। মেহেদী বা মেদী পাতা ছোট মেয়েরা নখে ও পায়ে দিত। কিন্তু বিধবারা এটা ছুঁইত না। বৃন্দাবন অবস্থানকালে দেখিয়াছি যদি কোন হিন্দু হাতে পায়ে মেদী পাতা দেয় তাহাকে কোন মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই মেদী বা মেহেদী এটা আরবী শব্দ। হিন্দুরা যেমন সকল শুভ কার্যে একটু তেল-হলুদ মাখে সেই রকম আরব ও পারস্য দেশে মুসলমানরা দাড়িতে, হাতে ও পায়ে মেহেদী মাখে। এখানকার মুসলমানরা মেদী পাতা দিয়ে দাড়ি লাল করিয়া থাকে। মেহেদী পাতার একটা গুণ হচ্ছে যে, রাস্তা চলে চলে যখন পায়ে হাজা-ঘা হয় তখন মেহেদী পাতা বেটে গরম করে পায়ে দিলে ব্যথা সব মরে যায়।

পঞ্চামৃত

পুষ্পোৎগম প্রথা গৃহ্যসূত্রে আছে। কালিদাসের রঘুবংশের তৃতীয়খণ্ডে পুংসবন ক্রিয়া হইতেছে প্রথম ও পরে গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তক ক্রিয়া। পঞ্চামৃত, কাঁচাসাধ ও পাকাসাধ অতি প্রাচীনক্রিয়া। সীমন্তক্রিয়ার অনেক ঘটা হইতেছে, পুরাতন অনেক বই-এ তা পাওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় মৃৎভক্ষণ রঘুতে রহিয়াছে। আগে পাতখোলা খাইত—হাঁড়িওয়ালার দোকানে পাতলা পাতলা সোঁদা সোঁদা গন্ধ ও মুড়মুড়ে, অভাবে উনুনের পোড়া মাটি খাইত। এইটা হ'ল রঘুর তৃতীয় সর্গে সুদক্ষিনীর মৃৎভক্ষণের কথা, যেখানে বারযোসিতার নৃত্যের কথা আছে। এখন সেটা হিজড়ের নাচে পরিণত হইয়াছে। পাকা সাধ বা সীমন্তক্রিয়ার আগে খুব ঘটা হইত। পুরানো বইয়ে রাণীদের পাকাসাধে খুব খরচের কথা রহিয়াছে, অবশ্য গৃহ্যসূত্রেও এর উল্লেখ আছে। আর একটা ছিল অষ্টম বা নবম মাসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া একটা ডাব কাটিয়া খাইয়া ডাব ফেলিয়া চলিয়া আসা। ইহা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে চান্দ্রায়ণ প্রথাতে আছে। তাহা হইলেও ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। তখনকার দিনে গর্ভিনীকে ফাঁকা ছাদে চাঁদের আলোয় শুইতে দিত না। সেটা খুব ভাল প্রথা ছিল, কারণ চাঁদের আলোয় গর্ভপাতের সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বৃদ্ধারা গর্ভিনীকে চাঁদ দেখিতে দিত না। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে।

পুত্র জন্মাইলে শুভসংবাদ দেওয়া

আগেকার কালে ছেলে জন্মাইয়াছে এই সংবাদ দিতে হইলে বোক্‌নো করে তৈল ও মাষকলাই বিলান হইত। রঘুতেও রহিয়াছে দিলীপ সব দান করিতেছে, যথা--

"জনায় শুদ্ধান্ত-চরায় শংসতে
কুমার-জন্মামৃত-সম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়-মাসীৎ এয়মেব ভূপতেঃ
শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥"

রঘুবংশম্ ॥ ৩।১৬ ॥

অনন্তর একজন ভৃত্য নৃপতির সন্নিধানে আসিয়া পুত্রোৎপত্তির শুভ সংবাদ নিবেদন করিলে মহারাজ দিলীপ যৎপরোনাস্তি প্রফুল্ল হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ফলতঃ ভৃত্যকে রাজার তিনটি মাত্র অদেয় ছিল—

সুধাংশু সদৃশ শুভ্রচ্ছত্র ও দুইটী চামর ॥

কিন্তু বোক্‌নো করে তেল ও মাষকলাই দেওয়ার প্রথাটা পরে উঠে যায়। আমাদের সময় ঢুলী বিদায়টা খুব বাড়াবাড়ি হইত। ঢুলীদের সাবেকী গান ও সেই সুর এখনও রহিয়াছে।

"রাণী তোর ভাগ্য ভাল পেয়েছিস গো নীলরতনে।
আর নন্দরাণীর কোলে কেলে সো—না।"

ঢুলীদের গান অপরিবর্তনীয় এখনও সেটা চলে আসছে কিন্তু সুরটা বড় মিষ্ট। তখনকার দিনে ভদ্রলোকের বাড়ীতে রসুন ব্যবহার হইত না কিন্তু যখন প্রসূতি সন্তান প্রসব করিয়া অচেতন হইয়া পড়িত সেই সময় রসুন বাটিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দেওয়া হইত। কোন কোন সময় বাটীর বিধবা গিন্নী নিজে রসুন চিবাইয়া অজ্ঞান প্রসূতির মুখে গুঁজিয়া দিত, কারণ তখন ব্র্যাণ্ডির প্রচলন ছিল না। এখন রসুনের স্থলে ব্র্যাণ্ডি ও নানাবিধ ঔষধের প্রচলন হইয়াছে। এখন কাঁচি দিয়া নবপ্রসূত শিশুর নাড়ী কাটিয়া দেয় তখন কাঁচি বা ছুরির ব্যবহার হইত না, চেঁচাড়ী দিয়া নাড়ী কাটা হইত। বাঁশের ছাল বিশেষতঃ কাঁচা বাঁশের, সেটা ছুরির মতন ধার হইত এবং তাই দিয়া নাড়ী কাটা হইত। তখনকার দিনে বাটীর

বৃদ্ধারা এবং পাড়ার পরিপক্ক ধাত্রী বা দাইয়েরা প্রসূতির সকল কার্য অতি সূক্ষ্মভাবে জানিত। এখনকার অনেক ডাক্তারের চেয়ে তারা এইসব ভাল জানিত। প্রসবের ব্যাণ্ডেজ অতি সুন্দর ভাবে জানিত।

আঁতুড় ঘর

আঁতুড় ঘর শব্দটি প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয় না। আমার এইরূপ অনুমান। আঁতুড় ঘরের দরজার দুকোণে দুটি গোবরের পুতুল দেওয়া হইত এবং কড়ি দিয়া সেই গোবরের পুতুলের চোখ, হাত, বুক নির্ণয় করা হইত। পাঁচকড়া বা সাতকড়া কড়ি লাগিত আর দরজায় একটা লোহার শাবল রাখা হইত। ঘরের ভিতর কতকগুলো কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিত। এই আগুন সব সময় জ্বলিত। এখন কথা হইতেছে দরজায় দুটো গোবরের পুতুল দেওয়া হ'ল কেন? ইহাকে চলিত ভাষায় ষষ্ঠী বলে। কিন্তু ষষ্ঠী কথাটা স্বস্তিকার অপভ্রংশ। দোকানের খাতায় যে সিন্দুর দিয়া গণেশ করে বা বাটীর দরজায় শুঁড়কাটা গণেশ করে এটা সেইটা। স্বস্তিকার পুরাতন চেহারা এইরূপ 卐 এই স্বস্তিকায় ইন্দ্রের দুই বজ্র পরস্পর মিলিত রহিয়াছে এবং ইহা ইন্দ্রেরই চিহ্নস্বরূপ। জেরুজালেম অবস্থানকালে Dr. Bliss এর "Report of the Palestine Exploration fund 1896-97 পড়িয়া দেখিলাম এই স্বস্তিকা প্রাচীন ইহুদীজাতির ভিতরও ছিল এবং M. Soloman বা Milton যাহাকে Brook বলেছে তাহার পাশে একটা পাহাড়ে লম্বা সুড়ঙ্গ আছে। এই সুড়ঙ্গের গায়ে এই স্বস্তিকা আছে। Mexico প্রভৃতি নানা দেশে প্রাচীনকালে ইহা ছিল। গ্রীকদের ভিতরও ইহা ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে-সকল যজ্ঞীয় ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রদেবতা বা রুদ্রদেবতা বর্ণিত হইতেছে। আর ইন্দ্রের হাতে এই বজ্র রহিয়াছে, "বজ্রং সমূক্ষণ ইব বজ্র-পানি।" সেই বজ্র পরে

মাঙ্গলিক চিহ্ন হইল এবং এখন তাহা ষষ্ঠী বা গণেশে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য প্রসবগৃহে ছুটো গোবরের পুত্তলি ঐরূপভাবে দেওয়া হইত। লোহার শাবলটা কেন দেওয়া হ'ত এ বিষয়ে আমি এখনও কোন অনুসন্ধান করি নাই। পুরান গ্রন্থে কি আছে পাঠকেরা অনুসন্ধান করিতে পারেন।

তাহার পর ঘরের অগ্নি। এই অগ্নি ছিল প্রাচীনকালের জাত অগ্নি। প্রাচীনকালে জন্মাইবার সময় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হইত সেই অগ্নিতে শৈশবকাল হইতে বার্দ্ধক্যকাল পর্যন্ত হোম করিত। অবশেষে মৃত্যুকালে সেই অগ্নিতেই তাহার বহ্নিসংস্কার হইত। এইজন্য তখনকার দিনে আঁতুড় ঘরের আগুন নিভাইতে দিত না, নিভিয়া যাইলে বুড়ীরা বকাবকি করিত। এখন বোধ হয় সেইসব নিয়ম আর নেই। তখনকার দিনে প্রসূতিকে তেল মাখাইত, সেঁক দিত আর ঝাল খাওয়াইত যথা শুঁট, পিপুল ও কালোমরিচ গরম ঘৃতের সহিত খাইতে দিত। ইহাকে চলিত কথায় বলিত তাপঝাল। নবপ্রসূত শিশুকে তেলের ন্যাকড়ায় ভিজাইয়া রাখিত। তখনকার দিনে Oilcloth ছিল না। কুলোর উপর তুলো দিয়ে ছোট শিশুকে রাখিত, আর বুকে একখানা তেলের ন্যাকড়া রাখিত এবং ঝিুকি করে ছুধ নিয়ে তুলোর পলতে করে খাওয়াত। এইজন্য লোক বলত—কুলোয় শুয়ে তুলোয় ছুধ খাওয়াত।

ষেটেরা

তারপর পাঁচদিনের দিনে প্রসূতি মাথা ঘসে স্নান করলে তারপর হল ষেটেরা। এই ষেটেরার দিন তালপাতার তীর করে বাখারি দিয়ে চারকোণে একটা পিঁড়ের উপর মাটির দোয়াত, খাগের কলম আর খানকতক তালপাতা দিত। বিধাতা পুরুষ রাত্রিতে আসিয়া তাহার কপালে ভাগ্য লিখিয়া দিবে। কোন

কোন বাটীতে এই ষেটেরা পূজার রাত্রিতে কিছু দান-ধ্যান করিত। যাহা হউক বাংলার এই ষেটেরা পূজা। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে ছোটুই বলে। এইদিনে প্রসূতি স্নান করিল ও নিজের শয়নঘরে যাইল এবং ঐদিন উহাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান হয় এবং শিশুর জন্মপত্রিকা ঠিক করা, নামকরণ ইত্যাদি হয়। বেশ ধুমধাম হয়, তবে সমস্ত নিরামিষ। আমি সিন্ধীদের বাটীতে ছোটুইতে গিয়াছিলাম, এই ছোটুই প্রথাটা খুব প্রাচীন কারণ পুরান বইতে এর গল্প পাওয়া যায়।

আটকৌড়ে

তারপর আটকৌড়ে। তখনকার দিনে আটকৌড়েতে ভারী ধুমধাম হ'ত। পাড়ার সব ছেলেরা আসত শুধু মেয়েরা বাদ। তারপর একটা কুলো সব ছেলেরা ধরে গোল করে ঘিরে কাঠি দিয়ে বাজাত। নবপ্রসুত শিশুর জয়জয়কার হোক এবং শিশুর উর্দ্ধতন পুরুষদের গালাগাল দিত। মাঝে মাঝে গিন্নীরা বলে দিত—"ওরে, ও তোর খুড়ো সম্পর্কে হয়, তোকে বলতে নেই", খালি সেই ছেলেটি বাদ হ'ত। তবে উর্দ্ধতন পুরুষের একরূপ উত্তম-মধ্যম জলযোগ করা হইত, মাতৃকুল পিতৃকুল উভয়েরই। তারপর কুলো ভেঙ্গেচুরে ফেলে দেওয়া হ'ত। আটকৌড়ের তখন আমোদ ভারী ছিল। পাড়ার সব ছেলে একত্র হ'ত। ছোট মেয়েরা কুলো বাজাতে পারত না তাই তারা আশেপাশে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে চাইত। তারপর আটকৌড়ের জলপান বিতরণ করা হ'ত। খই, চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি আর আট রকমের কড়াইভাজা স্তূপাকার করে রাখা হ'ত। সব ছেলেদের কোঁচড়ে একসরা দুসরা জলপান দেওয়া হ'ত আর একটা বা দুটা মিঠাই দেওয়া হ'ত, সঙ্গে একটা বা দুটা পয়সা থাকিত। এই মিঠাই নূতন খাতাতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আর

পাড়ার ছেলেদের কি আমোদ। আটকৌড়ের নিমন্ত্রণের আবশ্যক ছিল না। ছেলে মহলে খবর পেলেই সব ছুটিত। তখন ছেলেদের কাপড় পরিতে হইত না হ'লে কুলো বাজাতে পেত না। যারা কাপড় পরিত না তাদের নিয়ে খেলেখেলা হ'ত। আর মাঝে মাঝে কাঠিটা তাদের হাতে ঠেকিয়ে দেওয়া হ'ত। ছেলেবেলায় আমরা পাড়াময় আটকৌড়ে করে বেড়াতুম। তখনকার দিনে খুব ঘটা হ'ত।

ষষ্ঠীপূজা

তারপর ষষ্ঠী পূজা। "আইরে বুড়ি ষষ্ঠীতলা, তোকে দোব খই কলা।" আঁতুড় শেষ হলে ষষ্ঠী পূজা হ'ত। মাটিতে একটা বটগাছের ডাল পুঁতিত। ভট্চার্যি কি পূজা করত জানি না। ছোট ছোট খই-চুপড়ি করে খই বাতাসা কলা আর এক কড়া কড়ি দিত। তার জন্যে আমরা চুপ করে বসে থাকতাম। তারপর হলুদ জল করে বাঁশপাতা দিয়ে ছিটিয়ে দিত। সেই হ'ল শান্তির জল। অন্নপ্রাশন আজও ঠিক আছে।

চুল বাঁধা

তখনকার দিনে স্ত্রীলোকদের চুলবাঁধা বা কেশবিন্যাস কিছু পৃথক ছিল। যাঁহারা সধবা স্ত্রীলোক তাঁহারা মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া চুল বাঁধিতেন এবং বিধবারা সিঁথি না কাটিয়া মাথার পিছনে চুলটায় একটা গাঁট বাঁধিত। এক রকম চুল বাঁধা ছিল, তাহাকে বেনে খোঁপা বলিত। সেটা আলগা চুল বা ফিতে বাঁধা চুল একটা কাঁসের মধ্যে খানিকটা গলিয়ে একটা খোঁপা বাঁধা হইত। ঠিক যেন একটা কালো পাখি মাথার পিছনে বসে আছে। এলোচুলের খোঁপা এক রকম হ'ত। আর এক রকম হ'ত চুলেতে চুলেতে একটা বিনুনি (বেণী) করে তাতে নানা রকম ফিতে জরি দিয়ে ঘুরিয়ে একটা চাকার মত করে পিছনে বাঁধত। তাতে

সজারুর কাঁটা, পরে লোহার কাঁটা দিয়ে আটকে রাখত, তাকে বলতো ফিরিঙ্গী খোঁপা। আর এক রকম খোঁপা হ'ত মাথার ব্রহ্মতালুর উপর। সেটা এলোচুলেতেই প্রায় হ'ত। তাহাকে ঝুটকি বলিত। চলিত কথায় লোকের রাগ হইলে বলিত, "তোকে ঝুটি ধরে আনব।" তাকে top knot বলে। আর অপরগুলোকে back knot বলে। আর এক রকম হ'ত। ছোট মেয়েদের অল্পসল্প চুলেতে একটা চ্যাঁচাড়ির ছোট বিঁড়ে করে তার ভেতর চুল গলিয়ে দিয়ে বাঁধত। একে বলে, "ঝুটকি" "ঝুটকি ঈশ্বরী চাক বাজানা ঈশ্বরী" এই বলে ছোট মেয়েদের আদর করা হ'ত। এতদ্‌ব্যতীত পেটেপাড়া এক রকম ছিল অর্থাৎ সবচুল কাঁকুই (চিরুণী) দিয়ে আঁচড়ে পিছনে খোঁপা বাঁধত। আর এক ছিল পেতে পড়া সিঁথে কাটা, এতে সিঁদুর দেওয়া হ'ত। বিনুনি সাধারণত একটা হ'ত কিন্তু ছোটমেয়েরা অনেকগুলি বিনুনি করত। এই ছিল তখনকার দিনের চুল বাঁধা।

পুরুষদের মধ্যে বৃদ্ধেরা অনেকেই মাথা মুড়াইতেন এবং মাথায় একটি শিখা রাখিতেন। তখনকার দিনে শিখা রাখাটা বৃদ্ধদের মধ্যে প্রথা ছিল। কিন্তু যাহারা ইংরাজী পড়া অথচ প্রাচীন লোক তাহারা চুলটা ছোট করে ছাঁটিতেন। তখন টেরি কাটার প্রথা ছিল না। এটা পরে হইয়াছে। এই চুল বাঁধা কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেতর কিছু পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা এক রকম চুল করিতেন। এবং নবশাক ও অপর শ্রেণীর লোকেরা একটু পৃথকভাবে চুল রাখিত এইজন্য বোধহয় বেনে-খোঁপা, ফিরিঙ্গী-খোঁপা এইসব নাম হ'ল। সধবারা সকলেই সিন্দুর ব্যবহার করিতেন। "কৌটায় ভরিয়া আনিয়াছি সিন্দুর" ইত্যাদি।

চুল বাঁধা বিষয়েতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। চতুর্ষষ্ঠী কলার ভিতর দেখিয়াছি কেশবিন্যাস একটি ধারা। এখানে কেশবিন্যাসের

মানে করিতে হইবে আভরণ মাল্যবস্ত্রাদি পরিধান ; সমস্তই এর মধ্যে আসে, কেশবিন্যাস অর্থে শুধু চুলবাঁধা নয়। আরও একটি বিশেষ কথা এই—আমরা পুরাতন প্রস্তর মূর্তিতে (Statue) অনেক সময় স্ত্রীলোক বা পুরুষ বা কোন শ্রেণীর লোক নির্ণয় করিতে দ্বিধা করি। কিন্তু যদি আমরা প্রথমে মূর্তির মস্তক লইয়া গবেষণা করি তাহা হইলে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় হইবে কেশবিন্যাস। প্রথমে স্থির করিতে হইবে এই মূর্তি পুরুষ না স্ত্রীলোকের। কেশবিন্যাস দেখিয়া তাহা নির্ধারণ করা যায়। তাহার পর পুরুষ হইলে কোন শ্রেণীর লোক—রাজা বা পুরোহিত বা যোদ্ধা শ্রেণী বা বৈশ্য শ্রেণী বা দাস শ্রেণী। প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কেশবিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছিল। তারপর যদি স্ত্রীমূর্তি হয় তাহা হইলে রাণী কি পুরোহিত-কন্যা, কি ক্ষত্রিয়াণী বা শূদ্রাণী বা দাসী ইহা স্থির করিতে হয়। কেশবিন্যাসটা উপহাসের বস্তু নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কেশবিন্যাস দ্বারা সময় নির্ণয় করা যায়। যথা আধুনিক দশ আনা ছয় আনা চুল কাটা, পিছনদিকটা কামিয়ে সম্মুখে চুল রাখা এবং কানের উপর চুল কামান ইত্যাদি। এইজন্য কেশবিন্যাস বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মালা গাঁথা

তখনকার দিনে অল্পবয়স্কা মেয়েরা মালা গাঁথিতে বড় সুনিপুণ ছিল। সকলের বাড়ীতে তখন একটু উঠান ছিল এবং গোটাকতক ফুলগাছ থাকিত ও আনাচে কানাচে অনেক প্রকার ফুল ফুটিত। বিশেষ করে গরমিকালে অল্পবয়স্কা মেয়েরা নানাপ্রকার ফুলের মালা গাঁথিত ও পরিত। বৈশাখ মাসে ঠাকুরকে দিত এবং নিজেরা গলায় বা খোঁপায় পরিত। কথকরা মাথায় যে প্রকার ফুলের মালা দেয় তাহাকে স্রক্ (chaplet) বলে আর গলারটাকে মালা বলে।

তখনকার দিনে তিঁত ফুলের এক প্রকার লতানে গাছ ছিল তাতে পটলের মত বড় বড় ফল হ'ত এবং তার ফুলগুলোয় করাতের দাঁতের মত পাঁচটা পাপড়ি ছিল। এই তিঁত ফুলের এক রকম মালা হইত এ ছাড়া তো বেল, যুঁইয়ের নানা রকম মালা হইতই। বোম্বাইতে এক রকম ফুলের অলংকার বিক্রয় হইত, সেটা অর্দ্ধচন্দ্রের মত এবং তাহাতে ফুল প্রোথিত থাকিত। বোম্বাই-এর মেয়েরা বিশেষ করে মারাঠী মেয়েরা সেই অলংকারটি মাথা ও খোঁপার মাঝে বসাইয়া দেয়। সেটা দেখিতে বেশ হয়। সিরিয়াতে অবস্থান কালে দেখিতাম যে খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকেরা, যাহারা পূর্বে ফিনিসিয়ান (Phoenician) ছিল, তাহারা ফরাসীদেশীয় কাপড়ের ফুলের মালা কেনে এবং বিকালে সেটি মাথার উপর পরে। ইহাকে chaplet বলে। ইহা দেখিতে বেশ সুন্দর এবং যত্ন করিয়া রাখিলে অনেকদিন চলে। ভারতবর্ষে স্রক্ মাথায় পরিত এবং মালা গলায় পরিত। কিন্তু রোমান, গ্রীক বা অপর দেশীয় মূর্তিতে মাথায় Laurel পরা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, গলায় মালা পরা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধ

ইহা পূর্বেও যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে, বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। শ্রাদ্ধ প্রায় সমানভাবেই আছে। তবে আগে কায়স্থরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া একটি শিখা রাখিত এবং কণ্ঠদেশে উপবীত ও কণ্ঠী ধারণ করিত। এখন কিন্তু সেটি উঠিয়া গিয়াছে এবং মাথায় শিখাও রাখে না, এইমাত্র প্রভেদ। আমি বৃদ্ধদের দেখিয়াছি যে অনেকের গলায় কণ্ঠী থাকিত। লোকে বলিত কণ্ঠী না রাখিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তবে ইংরাজী শিক্ষার আমলে সে কণ্ঠীও উঠিয়া গেল।

আলপনা

আগেকার দিনে মেয়েরা পিঁড়েতে নানা প্রকার আলপনা দিতে পারিত। শুধু পিটুলি গুলে একরঙা নয়, লাল রঙ দিয়ে চক্র করে দিত। বিশেষতঃ বিয়ের সময় যেসব পিঁড়েতে বরকনে বসিত, সে সকল পিঁড়েতে পাড়ার ভিতর বিশিষ্ট স্ত্রীলোকরা আলপনা দিয়ে দিত এবং প্রত্যেক শুভদিনে সদর দরজা ও অন্য দরজায় আলপনা হইত। চৌকাঠে একরকম আলপনা হ'ত এবং তন্নিকটস্থ স্থানে পদ্ম বা অপর কোনো প্রকার চিত্র লম্বা শৃঙ্খলের মত তৈরী করা হ'ত। আমি পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছি যে এখনও মেয়েরা সুন্দর আলপনা দিতে পারে। কলিকাতায় এখন ইহার কম প্রচলন হইয়াছে। আলপনা প্রথাটা খুব ভাল। ঘরের মেঝেটি খুব সুন্দর দেখতে হয়। করাচীতে পার্সী স্ত্রীলোকেরা সকালে উঠিয়া সদরদোর ধোয়। তারপর একটা টিনের কৌটায়, তলায় বিঁদ বিঁদ করা থাকে, ফুলনক্সা করা সেই কৌটাতে সাদা গুঁড়া থাকে এবং সদরদোরের চৌকাটে সেই কৌটাটা ঠক্‌ঠক্ করে ঠুকিলে তাতে আল্‌পনার মত দেখিতে হয়। আমি দেখিয়াছি পার্সীদের সদরদরজায় আলপনা দেওয়া নিত্যই হইয়া থাকে। সাঁওতালদের ঘরে দেখিয়াছি তাহারা ঘরের দেওয়াল নিকিয়ে তাতে ফুল, মানুষ, বাঘ ইত্যাদি আঁকিয়া থাকে। সাঁওতাল মেয়েরা ঘরের দেওয়াল সুন্দরভাবে নিকিয়ে সুন্দর আলপনা দেয়। আদিমকাল হইতে আলপনা দেওয়া চলিয়া আসিতেছে এবং এই সামান্য প্রথা হইতেই চিত্রকলার প্রথা উঠিয়াছে। জংলীরা যদিও আলপনা দিতে পারে না কিন্তু একটুকরো কাঠকয়লা দিয়ে তারা অনেক প্রকার জন্তু, পক্ষী আঁকিয়া থাকে। কলিকাতায় আগে খুব আলপনার আদর ছিল এখন একেবারে কমিয়া যাইতেছে।

আলতা পরা

মেয়েদের পায়ে আলতা পরা এ শুধু বাংলাদেশে দেখিতেছি।

পশ্চিমে পায়ে আলতা পরা প্রথা দেখি নাই। এই প্রথা কি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ঠিক বলিতে পারিনা। সধবা স্ত্রীলোকের বাঁ হাতে লোহার নোয়া পরা এটা শুধু বাঙলাদেশে দেখা যাইতেছে। পশ্চিমে ইহার প্রচলন আছে বলিয়া তো চোখে পড়ে নাই। এসব প্রথা কবে উঠল এবং উঠিবার কারণ কি তাহা জানা যায় না।

চাকরদের গোঁফ কামান

আগেকার দিনে বাটীতে বাঙ্গালী চাকর থাকিত। হিন্দুস্থানী বা উড়ে চাকর ছিল না। চাকররা মেদিনীপুরের কৈবর্ত বা বর্ধমানের আগুরী হইত। এই হইল সাধারণ প্রথা। মেদিনীপুরের এক রকম কায়স্থ ছিল, 'কাস্ত' বা বাঁশকায়েত বলিত, তারা চাকর হ'ত। ঝি বা চাকরাণীও এই তিন শ্রেণীর লোক হইতে হইত। দেউড়ির দারোয়ান হিন্দুস্থানী হইত। সেইগুলো অকর্মণ্য, পেটমোটা ছিল এবং কেবল ডন কুস্তি লড়িত, এবং দাড়ির মাঝখান কামিয়ে দুগালে চুল ন্যাকড়া বেঁধে উঁচু করে রাখত আর একগাদা ছোলাতে ঘি, চিনি মাখিয়ে খেত। লড়াই দাঙ্গাতে এই হিন্দুস্থানী বাবাজীরা কোন কাজের ছিল না। তারা ছিল সদরদরজার শোভা। দাঙ্গাহাঙ্গামায় বাগ্‌দী পাইকরাই ছিল কাজের। সিয়ারাম, শিবারাম কোম্পানীরা শুঁড়কাটা জ্যান্ত গনেশের মত বেশ সদরদরজার বাহার ছিল। আর লোকজন এলে সেলাম ঠুকিত। তখন বাঙ্গলাদেশ বাঙ্গালীরা রক্ষা করত। ভাতখোরেরা বাঙ্গলাদেশ রক্ষা করত, ছাতুখোরদের আবশ্যক হইত না। তারপর ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গলাদেশটা একেবারে জরে গেল। দৈহিক শক্তি, বল, বীর্য যেন একেবারে ব্যোমপথে মিলিয়ে গেল। বাঙ্গলাদেশটা নির্জীব, নিস্পন্দ হ'ল। আমরা ছোটবেলায় বাঙ্গালী চাকর পাইক দেখিয়াছি। তখন উড়ে দেখলে অবাক হতাম, উড়ে যায় কথাটা একটা হেঁয়ালীর মত ছিল।

ছোটছেলে তখন, মনে করতাম কি করে এরা শূন্যে দিয়ে যায়। একে এরা উড়ে জাত, আবার উড়ে যায়। কিন্তু চোখে দেখতাম হেঁটে যায় এ-এক বড় সমস্যা।

তখনকার দিনে এক প্রথা ছিল যে, চাকরে গোঁফ রাখিতে পারিত না। চাকর যে মনিবের কাছে গোঁফ নেড়ে কথা কইবে এটা বড় অপমান। এজন্য চাকরদের গোঁফ কামান একটা প্রথা ছিল আর গলায় দু-নলা কণ্ঠী থাকিত। কিন্তু পাইকরা গোঁফ রাখিত। ভুঁড়ে হিন্দুস্থানী সিয়ারাম, শিবারাম দারোয়ান গোঁফ রাখিত। বাটীর খানসামারা গোঁফ রাখিত না। ইংলণ্ডে চাকরদের গোঁফ রাখিবার হুকুম নাই। পুরা দাড়ি রাখিতে পারে, গালপাট্টা রাখিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু গোঁফ রাখিলেই তাহার চাকরি যাইবে।

১৮৯৭ বা এই সময়ে সব চাকরেরা এক সভা করিল এবং এর দরখাস্ত জারী করিল যে চাকরেরা গোঁফ রাখিতে পারিবে না কেন? কিন্তু তাহাদের সেই দরখাস্ত কেহ মঞ্জুর করিল না; এখনও বোধ হয় সেই আইন চলিয়া আসিতেছে। এটাও বোধ হয় প্রাচীনকালের গোলাম প্রথা থেকে উৎপত্তি। যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা গোঁফ রাখিত। যথা "কায়েতকে কলমে চিনি, রাজপুতকে গোঁফে চিনি।" যাজক গোঁফ রাখিত না।

তখনকার দিনে চাকর, ঝি, রাঁধুনি ইত্যাদি অর্থাৎ সংসারের যত কর্মচারী-লোক সকলেই বংশাবলী ছিল। বুড়ো ম'লে তার ছেলে কাজ করবে, এই প্রথা ছিল। পাড়াগাঁয়ে জমিদার বা পুরাতন ভদ্রবংশের ভিতর চাকরান্ প্রথা ছিল। অর্থাৎ ধোপা, নাপিত, চাকর ইত্যাদি লোকদের জমি ধরান প্রথা ছিল। জমিদার সেজন্য খাজনা নিত না। আর সেই জমিভোগী লোকরা চাকুরি করিয়া খাজনা শোধ করিত। কলিকাতায় যদিও চাকরান্ প্রথা ছিল না

কিন্তু তখনকার দেশীয় প্রথা অনুযায়ী কর্মচারী-লোকেরা বংশাবলী থাকিত এবং বাটীর লোকের ভিতরই গণ্য হইত। এইজন্যই জ্যাঠা, ঠাকুরদাদা, দাদা, পিসে, মেসো, সব সম্পর্ক হইত। চাকরাণীকে এইজন্য ঝি বা কন্যা বলে। চাকর শব্দ ফার্সী কথা, আমি যখন পারস্য দেশে ছিলাম কেউ কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্যে সম্মান করিয়া বলিত, "মন্ চাকর সুনা" (আমি আপনার চাকর)।

আমাদের বাড়ী এবং পাড়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ব্রাহ্মণদের বাটীতে চাকর রাখিবার প্রথা ছিল। কলিকাতায় তখন বৈদ্যদের সংখ্যা কম। তখনকার দিনে কথা ছিল সংসারে যে একবার ঢুকিবে, মরে গেলে তাকে একেবারে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের বাটীর ঝি আমার পিতামহের সময় এসেছিল, আমার জন্মাবার আগে। বুড়ীর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর, ১৯২০ বা ১৯২১-তে বুড়ী মরে। আমি বাড়ীর ছেলেদের লইয়া এবং অপর কয়েকজনকে লইয়া তাকে কাঁধে করিয়া নিমতলার ঘাটে দাহ করিলাম এবং নিজে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়া কাঙ্গালী ভোজন, জ্ঞাতি ভোজন ইত্যাদি করাইলাম। মৃত্যুর চারদিন আগে বুড়ী আমাকে বলিল, "দ্যাখ্ তোর পিতামহের সময়ে এসেছি, এবং এই বংশে চির-কাল কাটালাম। তোমার বাপ খুড়োরা সংসারের অপর রাঁধুনী চাকরাণীকে নিজেরা কাঁধে করে সৎকার করেছিল, শ্রাদ্ধ নিজেরাই করেছে। তুমি এখনও বেঁচে আছ। আমার সময় আসন্ন, মরে গেলে আমার দেহ অপরে কেউ না ছোঁয়, নিজে কাঁধে করে নিয়ে যেও, আর নিজে শ্রাদ্ধ করে কাঙ্গালী ভোজন করাইও।"

আমাদের সেই ঝি জাতিতে কৈবর্ত ছিল এরূপ অনুমান করা হয়। কিন্তু কখনও আমরা সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহাকে সকলেই সম্মান করিয়া চলিত। এই পুরাতন ঝি, চাকর, রাঁধুনি বা সরকার যা পূজা-ব্রত করিত, সে সব খরচ সংসার হইতে পাইত।

তীর্থাদি, দান-ধ্যানের খরচও সব সংসার হইতে পাইত। বাটীর বা বংশের কর্তা-গিন্নীর মতন তাহারা আধিপত্য করিত। তাহাদের দেশে আত্মীয় কুটুম্ব যদিও বা থাকিত তাহাদের উপর আর টান থাকিত না ; ঠিক যেন বংশের পালিত পুত্র বা পালিত কন্যা হিসাবে থাকিত। অন্তিমে তাহাদের সৎকার করা ও শ্রাদ্ধ, যাদের কাছে থাকিত তাহারাই করিত। তখনকার দিনে এই প্রথাটা সব ভদ্রঘরেই ছিল।

এশিয়ার সব দেশেই আছে যে বাপ-ঠাকুর্দার আমলের চাকরের সমুখে কেহ তামাক খায় না এবং তাহাকে 'আজ্ঞে' 'আপনি' এ সব সম্মানসূচক বাক্য বলিতে হয় এবং জ্যাঠা বা কোনো সম্পর্ক ধরিয়া সম্বোধন করিতে হয়। এখনকার মত নগদা মাইনের ঝি-চাকর তখন ছিল না। এজন্য তখনকার দিনে ঝি-চাকর এত বিশ্বাসী ছিল। আর এইসব রাঁধুনি বা চাকর সমস্ত জীবনের মাইনে থেকে এবং তত্ত্বের বিদায় থেকে যাহা কিছু জমাইত মরিবার সময় যে-কটি ছোট ছেলেমেয়েকে তাহারা মানুষ করিত, সেই জমান টাকা তাদের ভাগ করে দিয়ে যেত যেমন লোকে নাতী, নাতনীদের জিনিসপত্র ভাগ করে দিয়ে যায়। আমরা ভাই-বোনে এই রকম কিন্তু কিছু কিছু পেয়েছিলাম। ওটা হল পুরানো কর্মচারীদের প্রথা। সরকার যারা হ'ত তারাও এ রকম বংশানুক্রমে চলিত। সেইজন্য তারা তত চতুর কার্যনিপুণ না হইলেও বড় বিশ্বাসী হইত। বর্দ্ধমানের আগুরী ঝি যারা ছিল তারা আমাদের সংসারে তিন পুরুষ ছিল।

মেদিনীপুরের এক রকম সম্প্রদায় ছিল তাদের বাঁশকায়েত বা কাস্ত বলিত, তাহারা চাকর হইত। এইজন্য গঙ্গার ধারে বাস করা কায়স্থরা মেদিনীপুরের কায়স্থর সহিত কুটুম্বিতা করিত না।

নফর

পূর্ববঙ্গে নফর বলে এক শ্রেণীর কায়স্থ আছে। সম্ভবতঃ এই

নফররা নবাবী আমলে গোলাম ছিল। এখন তাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি "বাঙ্গাল" বলে বড় একটা ঘৃণার কথা ছিল। বাঙ্গাল দেখিলে আমরা ঠাট্টা করিতাম ও উৎপাত করিতাম। অধিকাংশ লোকের কাজ ছিল কুয়ো থেকে ঘটি তোলা। গরমিকালে তুপুরে আম বেচতো এবং রাত্রে কুলফী বরফ বা ঘুগনিদানা বেচতো, জিজ্ঞাসা করলে বলত কায়স্থ কিন্তু অধিকাংশ লোক ছিল "কর" বা "সেন"। তারা বড় আড়কো (তর্কের) লোক ছিল এবং আমরা গাল দিয়ে অনেকে ছড়া করে পিছনে পিছনে যেতাম। এইজন্যে দিনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" বা অন্য কোন বই-তে, যাকে বলে নাটকের Villain বা Sub villain অর্থাৎ নাটের গুরু যে তুষ্টু লোক, এটা দেখাতে হোলে সেটা 'বাঙ্গাল' হইত। "সধবার একাদশীর" গল্প সকলেই জানেন। যথা রাম মাণিক্য—"......এতো অকাদ্য খাইচি তবু কলকত্তার মত হবার পারচি না? ......গোরার বারীর বিস্কুট ভক্কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি, এতো কর্য্যাও কলকত্তার মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ দেহেতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুমীরে বক্কোন করুক"। "বেল্লিক বাজারের" দোকড়ি সেন সেই শ্রেণীর লোক, "টাহা প্রস্তুত প্যামান্ট করি সব ফাস্" ইত্যাদি।

কিন্তু যখন রেল খুলিল এবং পূর্ববঙ্গের সহিত গতিবিধি দ্রুতভাবে হইল তখন বুঝিলাম এ শ্রেণীর লোক নফর ছিল। তারা ভদ্রলোক ছিল না। যাহাকে বলি বঙ্গজ কায়স্থ, তারা এ শ্রেণীর ছিল না। সেইজন্য তাহাদের প্রতি এমন বিদ্বেষ্টা হয়েছিল। মেদিনীপুরের কায়স্থরা বোধ হয় এই নফর শ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা অপরের বাটীতে কাজ করিত। তাহারা অল্পদিনের ভিতর রান্না, বাটীর জল তোলা, কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটা ইত্যাদি কাজ করে খানসামায় উন্নত

হইত। বাবুর তামাক দিত, তেল মাখাত ও গিলে দিয়ে চুনট করে কাপড় কুঁচাত। এইজন্য ইহারা কৈবর্ত চাকর হইতে খানসামা হইত। তখনকার দিনে এই প্রথা ছিল।

পাচক

এখন যেমন বাটীর পাচক ব্রাহ্মণ না হইলে চলিবে না, তখন কিন্তু কায়স্থের বাটীতে কায়স্থ পাচক থাকিত। তাহারা কিন্তু বেশ ভাল রন্ধন করিত। কলিকাতায় এখন সে-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কর্তারা যখন সহরের বাহিরে যাইতেন, সেই সব লোক সঙ্গে থাকিত এবং রসুইয়ের কাজ করিত, ব্রাহ্মণ না হইলে রান্না হইবে না, এ কড়াকড়ি ছিল না। ব্রাহ্মণদের সমাজে তখন একটা সম্মান ছিল এবং পাচকের কার্য তাহারা করিত না। অন্ততঃ কলিকাতার সন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণরা একটু মান-সম্ভ্রমে থাকিত। তাহারা অপরের বাটীতে পাচক থাকা হীনতা মনে করিত এবং সকলেরই একটু একটু ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল এবং নানা পরিবার হইতে বার্ষিক পাইত। ইহাতে এক রকম সুখে সংসার চলিত।

ব্রাহ্মণরা পাচকের কাজ লইলে সেই সকল লোক সমাজে একটু হীন হইল এবং এক ছড়া উঠিল "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে তাহার কাজ কানে ফোঁকা, হীন হইলে শাঁকে ফোঁকা আর মূর্খ হইলে চোঙ্গায় ফোঁকা।" অর্থাৎ পণ্ডিত হইলে অধ্যাপক হইবে, দীক্ষা দিবে, হীন হইলে পূজারীর কাজ করিবে আর মূর্খ হইলে রান্নার কাজ করিবে, বাঁশের চোঙ্গায় ফুঁ দিয়া কাঠের উনান ধরাইবে।

গোলাম প্রথা

যখন ইংরাজ রাজত্ব প্রথম এখানে হ'ল তখন পর্যন্ত গোলাম

কেনাবেচা হইত। সিমুলিয়ার কোন এক লোক ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে আগ্রায় চাকুরি করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় অনেক টাকাকড়ি আনিয়াছিলেন এবং আগ্রা হইতে একটা ছেলে ও মেয়ে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সেই ছেলে ও মেয়েতে বিবাহ দিলেন এবং নিজের বাটীর কাছে একখানা বাড়ী করিয়া দিলেন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহারা পরে 'দত্ত' হইল এবং কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিল। এই স্ত্রী-পুরুষের পুত্র-কন্যাকে আমি নিজে দেখিয়াছিলাম। যদিও তাহারা বনিয়াদী কায়েত হইযাছিল কিন্তু চেহারাটা গ্যাট্টা-গোট্টা হিন্দুস্থানী ধরনের ছিল। তাহার পর তাহারা সাধারণ কায়স্থদের সঙ্গে করণ-কারণ করিল এবং সমাজে চলিয়া গেল। চলিত কথায় আছে যে, জাত হারালে কায়েত, ধর্ম হারালে বোষ্টম এবং গোত্র হারালে কাশ্যপ এটা সত্য। অর্থাৎ কায়স্থের হাতে তখন রাজ-শক্তি ছিল এবং নিজের দল বাগাইবার জন্য অপর সব জাতকে কায়স্থ করিত। পশ্চিমের ছত্রি যেমন অপর জাতকে ছত্রি করিয়া লয়। রাজশক্তির এই একটা চিহ্ন।

নানাবিধ গুল্ম-বৃক্ষাদির পূজার ইতিবৃত্ত :—

তুলসী গাছ

তখনকার দিনে সব বাটীতে তুলসী গাছ রাখিতে হইত। কথায় বলিত শালগ্রাম, তুলসী গাছ ও গরু না থাকিলে সেটা হিন্দুর বাটী নয়। পাড়াগাঁয়ে সব বাটীতে তুলসীমঞ্চ আছে অর্থাৎ ইটের একটা ঢিপি তার মাঝে গর্ত করে মাটি দিয়ে তুলসী গাছ পোঁতে। কিন্তু কলিকাতায় আমরা উঠানের একদিকে তুলসী গাছ পুঁতিতাম। নীচেটা বেশ করে নিকিয়ে গোড়ার কাছে একটা আল করে দেওয়া

হ'ত এবং তাহাতে জল দেওয়া হ'ত। "আলবালায় পালিলাম"। গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে ঝারা দেওয়া হ'ত। একটা বাঁশ বা কাঠি থেকে নিক্তির মত তিনটা দড়ি ঝুলিয়ে তাতে একটা ছোট ফুটো করা মালসা বসিয়ে দেওয়া হ'ত। আর সেই মালসার ফুটোয় একটা খড়কে বা ন্যাকড়া দেওয়া হ'ত। তাতে ধীরে ধীরে টোপে টোপে জল পড়িত। সন্ধ্যাকালে তুলসী গাছের তলায় একটা করে প্রদীপ দেওয়ার খুব প্রথা ছিল—"সুবর্ণদেউটি যথা তুলসীর মূলে।" তুলসী গাছকে প্রণাম করিবার মন্ত্র ছিল—"তুলসী তুলসী, তুমি তুলসী বৃন্দাবন তোমার শিরে ঢালি জল, আমার যেন হয় বৈকুণ্ঠে বাস।" তখনকার দিনে লোকের তুলসী গাছের উপর বড় ভক্তি ছিল। আমরা ছোট ছেলেরা ভাই-বোন মিলিয়া তুলসী তলায় একটি করিয়া প্রদীপ দিতাম। আর খুব সেবা ও প্রণাম করিতাম। তখন আমাদের ধারণা ছিল তুলসী গাছই স্বয়ং দেবতা। বাংলা ছাড়া উত্তর ভারতের হিন্দুরাও তুলসী গাছকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে জল দেয় এবং গোড়ায় একটি প্রদীপ দেয়।

পূর্ববঙ্গে দেখিলাম শবদাহের নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। এদেশে শ্মশান বলিয়া যেমন একটি স্থান আছে, পূর্ববঙ্গে তেমন নাই। যে যার নিজের বাটীতে শবদাহ করে এবং যেখানে শবদাহ হয় সেই স্থানে একটি তুলসীমঞ্চ করিয়া দেয় কেহ বা মাটির ঢিপি করে কেহ বা পাকা ইটের গাঁথনি করে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কেহ কেহ শবদাহ স্থানে মঠবাড়ি করিয়া দেয়। চিনির মঠ যেমন দেখতে হয়, অনেকটা সেই আকৃতির, অর্থাৎ গীর্জার চূড়ার মত খুব একটা উঁচু স্তম্ভ এবং তাহার গোড়াতে একটা গর্ত থাকে সেখানে প্রদীপ দেয়।

ভুবনেশ্বরে এক দীঘির ধারে ঐরূপ ছোট ছোট অস্থিস্তম্ভ আছে, অনেকগুলি। এই তো হ'ল পরিদৃশ্যমান ব্যাপার। কিন্তু কেন এই সব

হইয়াছে এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে। তুলসী গাছ যে কবে থেকে ঠাকুর হল, এটা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। পুরাণের গল্প এ বিষয়ে ঢের আছে, সে সকলেই জানে। সে-সব অতি আধুনিক। ও-সব মেয়েদের ঠকাবার গল্প। কিন্তু তুলসী গাছের প্রতি এত শ্রদ্ধাভক্তি কেন হ'ল এবং কোন সময় হ'ল তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে মঞ্চটার বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। প্রাচীনকালে মৃতদেহ সৎকার করা হইত এবং অস্থি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে অগ্নিসংস্কার বলা হইত। কোন কোন স্থলে মৃতদেহ গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে জলসমাধি বলিত। বৃন্দাবনে ও হরিদ্বারে জলসমাধির প্রথা আছে; তবে রাজপুতানা, সিন্ধু প্রভৃতি দেশ হইতে অস্থি আনিয়া পূজাদি করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে।

অস্থি-রক্ষা প্রথা।

আগে অস্থি রক্ষা করিয়া রাখার প্রথা ছিল না। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর অস্থি রক্ষা করা হয় এবং অস্থি ও ভস্ম বিভক্ত করিয়া নানা স্থানে তাহা রক্ষা করা হয় এবং সেই সকল ভস্ম ও অস্থির উপর স্তূপ নির্মাণ করা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্তূপ ভারতবর্ষের চারিদিকে হইতে লাগিল এবং অর্হৎ বা সাধুদিগের মৃত্যু হইলে দাহ করিয়া বা মৃৎ-সমাধি দিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোক নিজের পিতা-মাতার জন্যে স্তূপ করিতে আরম্ভ করিল। বিক্রমপুর একসময় বৌদ্ধদিগের কেন্দ্র ছিল এইজন্য বিক্রমপুরে স্তূপ বা মঠবাড়ী প্রথা এখনও প্রচলিত। ক্রমশঃ স্তূপের আকার খর্ব হইয়া ছোট আকার ধারণ করিল। পরে যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবল হইল তখন এই খর্বাকৃতি স্তূপের উপর তুলসী গাছ

বসিল। এইরূপে শবদাহের স্থানে তুলসীমঞ্চ বা গাছ আবির্ভূত হইল। কিন্তু প্রকৃত তুলসী গাছের উৎপত্তির কথা বিশেষ জানা যাইতেছে না।

বেল, অশথ, বট প্রভৃতি

তুলসী গাছ যেমন বিষ্ণু-উপাসকদের নিকট পবিত্র গুল্ম বলিয়া পরিগণিত হইল, বেল গাছ সেইরূপ শৈব-উপাসকদের পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইল। দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর রাত্রে বিল্ববরণ হয় এবং বেল পাতা শিবের পূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেল পাতা বিষ্ণুপূজায় আবশ্যক হয় না। তারপর দেখিতেছি আগেকার দিনে অশথ ও বট গাছ প্রতিষ্ঠা করিত। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসেই হইত এবং তাহাতে পূজাদি ও লোক খাওয়ান হইত। সাধারণ স্ত্রীলোকের ধারণা এই অশথ ও বট পরকালে তাহাদের সন্তান হইয়া ভগবানের কাছে সাক্ষ্য দিবে। এটা চলিত মেয়েলী কথা; কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে অশথ গাছকে ন্যগ্রোধ বলে। বুদ্ধ এই বোধিদ্রুম তলায় উরুবিল্ব গ্রামে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এইজন্য এই অশথ গাছকে বৌদ্ধেরা অতি ভক্তি করিত এবং বুদ্ধগয়া হইতে এই গাছের শাখা সিংহল পর্যন্ত গিয়াছিল। ইহাকে অক্ষয়-বট বলে। আবার হিন্দুপুরাণে দেখা যায় নারায়ণ বটপত্রে শয়ন করেছিলেন। এই হ'ল বট ও অশথ বৃক্ষের পবিত্রতার কারণ। আবার নারিকেল গাছ হইল বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। ইহা ব্রাহ্মণ গাছ। নারিকেল গাছ তাই কাটিতে নাই। এখন কথা হইতেছে এই সকল গাছের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি কেন আসিল? এখনও পর্যন্ত গ্রামদেশে দেখা যায় যে বৈশাখ মাসে বৃদ্ধরা অশথ বা বট গাছের পাতা ছিঁড়িতে দেয় না। তাহারা বলে এই সব পাতা ছিঁড়িলে অকল্যাণ হবে, অর্থাৎ বুদ্ধের মাসে বুদ্ধের বৃক্ষের পাতা

ছিঁড়িতে নাই। এই প্রাচীন প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে। পরে যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মে ছাইয়া গেল তখন ন্যগ্রোধই দেবতা হইল। আর এক কথা উঠিতে পারে যে পুরাণে নারায়ণ বট পাতায় কেন শুইলেন? বৌদ্ধদের শক্তি চলিয়া গেলে পুরাণ উঠিল। বৌদ্ধধর্মের কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া এবং কতকটা বাদ দিয়া পুরাণ তৈয়ারী হইল। ন্যগ্রোধ সাধারণ লোকের নিকট পবিত্র, তাই রাখা হইল। কিন্তু তাহার উপর নারায়ণকে শয়ন করাইয়া বুদ্ধকে তাড়াইয়া দিল। স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে লেকচারকালে (লেখক কর্তৃক রচিত 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) একটা উপাখ্যান বলিয়াছেন যে গয়াতে গয়াশীর্ষ নামে এক স্থান ছিল। নদী কাশ্যপ, গয়া কাশ্যপ ও উরুবিল্ব কাশ্যপ নামে তিন ভ্রাতা এখানে এক আশ্রম করে। এইরূপ লেখা আছে যে তাহাতে প্রায় পাঁচ সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত। বুদ্ধের তখনকার নাম গৌতম (ব্রহ্মচারী), তিনি সেই স্থানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি বুদ্ধ নাম নিয়া প্রচার আরম্ভ করেন তখন গয়াশীর্ষ স্থানটি বৌদ্ধদিগের তীর্থ হইল এবং পরে যখন পৌরাণিক যুগ উঠিল তখন গয়াশীর্ষের স্থানটির মাহাত্ম্য রাখিল কিন্তু উহাকে বিষ্ণুর স্থান করিল। পৌরাণিক গল্প হইতেছে, গয়াসুর নামে এক অসুর ছিল, বিষ্ণু তাহাকে ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং এক পা দিয়া তাহাকে চাপিয়া আছেন এবং নিত্য সেই স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইবে ব্যতিক্রম হইলে অসুর উঠিয়া ভূমণ্ডল রসাতলে দিবে। এইরূপে বৌদ্ধতীর্থ পৌরাণিকরা দখল করিল এবং গল্পটা উলটাইয়া দিল। বট, অশ্বত্থ বা ন্যগ্রোধের যেমন পৌরাণিক গল্প আছে ইহাও তদ্রূপ।

বনস্পতি বা ওষধি

প্রাচীনকালে বনস্পতি বা ওষধি নাম পাওয়া যায়। বনস্পতি

হ'ল পুরানো বড় গাছ এবং ওষধি হ'ল চারা গাছ। এখন পর্যন্ত গ্রামের প্রান্তে পুরানো একটা গাছের তলায় পূজা দিয়া আসে। চলিত কথায় বলা হয় যে গ্রাম্য দেবতা সেখানে বাস করে। প্রাচীনকালে বনস্পতির যে পূজা হইত তাহা এ রকম কিনা বুঝা যাইতেছে না; কিন্তু যাগ-যজ্ঞেতে, দ্রব্যসম্ভারের ভিতরে বনস্পতি ও ওষধির নানা প্রকার নাম রয়েছে। ধীরে ধীরে বনস্পতি ও ওষধির পূজার প্রচলন হইল। এখনও একরূপে বা অন্যরূপে অনেক দেশে ইহার প্রচলন আছে। এই Tree worship and serpent worship একটা বিশেষ পাঠের জিনিস। ইহার খুব লম্বা ইতিহাস আছে এবং জাতির মনের গতি কোন সময় কিরূপ হইয়াছিল তাহার বেশ উল্লেখ পাওয়া যায়।

গাছে পতাকা ও ন্যাকড়া বাঁধা

পশ্চিম দেশে দেখিয়াছি কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে অশৌচের কদিন শ্মশান বা অন্য কোন স্থানে অশ্বথ বা বট গাছের ডালে কলসী বেঁধে দেয়, তাতে জল দেয় ও ছোট একটি ফুটা করে দেয়। বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের এ-প্রথা নেই। দারজিলিং-এ মা—আ—আ কাল (মহাকাল) নামে পাহাড়ের উপর একটা শিবের স্থান আছে। দেখিলাম সন্নিকটস্থ বৃক্ষের ডালে ভুটিয়ারা একটু একটু ন্যাকড়া বেঁধে দিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধদিগের যে ধ্বজা বাঁধার কথা আছে—"উড়িছে দেখিলে কি বৌদ্ধ পতাকা দেশ বিদেশে" এটা তাই। পুরীর মন্দিরে যে ধ্বজা বাঁধা এটাও বৌদ্ধ প্রথা। পারস্যদেশে অবস্থানকালে সহরে দেখিলাম যে একটা পুরানো গাছে লোকেরা একটু একটু ন্যাকড়া বাঁধছে এবং সেটাকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করে। যখন পারস্যদেশের জংলীদের সঙ্গে ইরাক বা মেসোপটেমিয়ায় যাইতেছি তখন পুরানো গাছ দেখিলেই সব Caravan থামিল এবং

সকলে একটু একটু ন্যাকড়া বাঁধিয়া দিল। আমিও রুমাল ছিঁড়িয়া একটু বাঁধিয়া দিলাম। সেসব হচ্ছে দেবতাদের আস্তানা, ন্যাকড়া বাঁধিলে যাত্রা শুভ হয়। এইটা হইতেছে Tree worship। ইহা Metaphysics-এর অন্তর্গত নয় তবে Natural religion-এর বটে। যাহা হউক আমাদের তুলসী গাছ এরূপ একটা কারণ থেকে হইয়াছিল, যাহার পূর্ব-ইতিহাস এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইউরোপে এইরূপ Tree worship বা বৃক্ষপূজা সেইরূপভাবে দেখিতে পাই নাই। London-এ আছে William's oak, এথেন্সে আছে Alexander's oak, Plutarch এইরূপ বলিয়াছেন কিন্তু Tree worship দেখি নাই। Egypt দেশে অবস্থানকালে Cairo হইতে Haleopolis স্থানে যাইলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে যীশু শৈশবে বাপ মার সঙ্গে সেইস্থানে ছিলেন। জায়গাটা একটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভিতরে একটা Fig গাছ অর্থাৎ যজ্ঞিডুমুর গাছ। Fig দুই প্রকার Fig এবং Sycamore. সেই স্থানে যত খ্রীষ্টান ভক্তেরা যায় সেই Fig গাছটাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং ডালে আপন আপন নাম লিখিয়া দেয়, কিন্তু গাছ খুব প্রাচীন নয় কারণ যজ্ঞিডুমুরের গাছ বেশি দিন বাঁচে না। যাহা হউক, এখানে সেই গাছটির প্রতি বেশ শ্রদ্ধাভক্তি আছে।

মনসাপূজা ও নাগপঞ্চমী

তখনকার দিনে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধন হ'ত। সেটা ভারী ধুমধামের দিন। নানা রকম তরকারি, কচু শাকের ঘণ্টে নারকোল কুরে দেওয়া, অনেক রকম ভাজা, ইলিশমাছের অম্বল আর চালতার অম্বল এই তো হ'ল তার প্রধান অঙ্গ। রাত্রে গরম ভাত ও গরম তরকারি খেতাম। বড় বড় গামলা করে সব ভাত ভিজিয়ে রাখা হ'ত। সকালে উঠানের ভিতর মনসা গাছ দিয়ে,

আলপনা দিয়ে মনসাপূজা হ'ত। মনসার নৈবেদ্য একটা আলাদা হ'ত। পূজা হয়ে গেলেই আমরা আরন্দ-র (অরন্ধনের) ভাত খেতে বসতুম। সে বড় আমোদের ছিল। তখনকার দিনে আরন্দ খাওয়া ছিল একটা ধুমধাম, পাড়ার অনেক লোক খাইত। যাহারা ভাত না খাইত তাহারা তরকারি লইয়া যাইত এবং আপনা-আপনির ভিতর এই তরকারি আদান-প্রদান চলিত। সেদিন কিন্তু ডোমপাড়ার লোকেরা হাঁড়ি আনিয়া ভাত লইয়া যাইত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণে দুর্গাপূজা ছিল। বাড়ার যে গিন্নী বা বুড়ো হইত, তাহাকে মনসার "গদ" গিলিতে হইত। একটুকরা করলা ,ও একটুকরা নেবুর খোলা এই রকম দু-একটা জিনিস মুখে গিলিয়া খাইতে হইত, দাঁতে যেন না ঠেকে। এটা বাটীর বুড়ীর মান্যও বটে, শাস্তিও বটে। London-এ অবস্থানকালে দেখিলাম যে Good Friday-এর পরে Easter Sunday হয়। সেইদিন Pancake খেতে হয়। অর্থাৎ একটা ময়দার গোলা করে frying pan বা চাটুতে সেঁকে নেবে। মোটামুটি আস্কে পিঠে হ'ল। সেইটা brown sugar বা দোলো গুড় দিয়ে বা একটু নেবুর রস দিয়ে খেতে হবে। নুন দিয়ে খেলে ধর্ম যায়। আমার ভাল লাগেনি বলে নুন দিয়ে খেয়েছিলাম। তাতে বকাবকি হয়। এইতো ইংরেজদের আস্কে খাওয়া। যে বাড়ার গিন্নী হবে তাকে Sturgeon fish-এর একটা শুকনো টুকরো খেতে হবে। এই মাছটা ভেটকি মাছের মত। এটা লম্বা দিকে ফালা করে শুকানো হয়। বাড়ীর গিন্নী সেই শুকনো মাছ এক টুকরো নিয়ে কুইনিনের গুলির মত তাকে গলায় ফেলে ঢক করে খায়। চিবুলেই ধর্ম যাবে। আমি খুব হাসতে লাগতাম আর ভাবতাম এরা মনসার গদ গিলছে। ভাল করে দেখলে সব দেশের মেয়েই এক, তবে তাদের বাহিরটা বদলেছে। সেই ভক্তি সেই গোঁড়ামি, সবই আছে।

মনসা এক মতে শিবের মন থেকে হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন গল্প আছে। ৪০০/৫০০ বৎসর আগে পাওয়া যায় বিষহরির পূজা। সম্ভবতঃ সেটি মনসা পূজারই একরূপ। পূর্ববঙ্গে আমি একস্থানে দেখিয়াছি—সেটা বিষহরির স্থান—যেমন দুর্গাপূজার চণ্ডীমণ্ডপ হয় সেই রকম একটা বিষহরির স্থান। তাহাতে দেখিলাম দুর্গা, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি সবই আছে কেবল সম্মুখে একটা বড় সাপ এবং নারদ প্রভৃতি অনেক মুনি রয়েছে ও আরও সব দেবতা রয়েছে। সেটাকে বলে বিষহরি কিন্তু ঠাকুর তো দুর্গাই। বিষহরি হচ্ছে যে বিষকে হরণ করে, সেইটি বোধহয় এখনকার প্রচলিত মনসা। বিশেষ কিছু বলা যাচ্ছে না। পশ্চিমের পাহাড়ের কোন কোন স্থলে এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে নাগপঞ্চমীর ব্যাপারটা খুব। বাংলাদেশে নাগপঞ্চমীর অত প্রচলন নেই। বাংলাদেশে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন মনসাপূজা হয়, ইহার কোন তিথি নেই। একখানা গৃহ্যসূত্রে দেখিলাম নাগপূজা পঞ্চমীতে নয়। পঞ্চতন্ত্রে আছে "শরাবে," অর্থাৎ শরাতে দুধ দিয়া সাপকে খাওয়ানো। কিন্তু এই সাপপূজা আর্যভূমিতে কবে থেকে হইল? রামায়ণ মহাভারতের সময়ে সাপপূজার বিশেষ উল্লেখ নাই। তবে মহাভারতে সমুদ্রমন্থনের সময় বাসুকি নাগের কথা পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানটি বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহাতে ধন্বন্তরী সুরা মস্তকে লইয়া সমুদ্র হইতে উঠিতেছেন এই উপাখ্যানটি আছে। মহাভারতে ধন্বন্তরীর কথা এই একবার পাওয়া যায়। কিন্তু দেব চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারের নাম বহুবার আছে। অশ্বিনীকুমারের প্রতি স্তবও রহিয়াছে, ধন্বন্তরীর গল্প পরে হইয়াছে। এইজন্যে তথাকার বাসুকি নাগের উপাখ্যান অতি পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

বৌদ্ধ যুগে সাপের বড় হুড়োহুড়ি। সাপের কতই বর্ণনা। অনন্ত

নাগের উপর যে নারায়ণ শুইয়া আছেন, এইগুলি পৌরাণিক যুগের গল্প, প্রাচীন গল্প নয়। যথা, মনুতে আছে, 'আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্নুনবঃ।' নরস্নু জলে শুয়েছিল এইজন্য নাম হল নারায়ণ। Assyrian বা অসুরীয়দিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, Nimrod-এর প্রস্তর মূর্তি ডান হাতে সাপ ধরে আছে আর বাঁ হাতে সিংহের মাথা রয়েছে, অর্থাৎ বুদ্ধি ও শক্তি। তাহলে অসুরীয়দিগের ভিতর সাপ একটা শ্রদ্ধার জিনিস ছিল। পরে ইব্রাহিমকে যখন বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয় (Exiled Ninivian) তখন সে পৈতৃক উপাস্য সাপটিকে শয়তানের বা দৈত্যের প্রতিরূপ করিল। এই থেকে ইহুদিদের গল্প সুরু হল। Assyrian-দের Ea (ইয়া) ও Anu (অনু) পরে Adam (আদম) and Eve (ইভ) হইল। Assyrian-দের দুটা ঠাকুর ছিল—Ea মানে Earth বা পৃথিবী, Anu মানে Firmament বা আকাশ। পৃথিবী স্ত্রী, আকাশ পুরুষ। এই উভয়ের সঙ্গমে সৃষ্টি হইয়াছে। ইব্রাহিম, পূর্বপুরুষ দেবতা Ea এবং Anu-কে Adam and Eve-এ তৈরী করিল এবং এই স্ত্রী পুরুষ হইতে ইহুদীদের পুরাণে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে একথা জানা আবশ্যক যে Ninu মানে Fish God, অর্থাৎ এই শহরে মৎস্য দেবতার বড় মন্দির ছিল তাহা হইতে এই শহরের নাম হইয়াছিল। সম্ভবতঃ Assyrian-রা পূর্বকালে সাপের পূজা করিত বা সাপকে উঁচু স্থান দিত।

ইজিপট্-এর পুরাতন জাতীয় নাম রোমক। সংস্কৃতে রোমক শব্দ ব্যবহার হয়। গ্রীকরা রোমককে ইজিপটাস বলিত। যেমন ভারতবর্ষকে India বলে। রোমকদের প্রাচীন রাজার প্রস্তর-প্রতিকৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে যে, রাজার মাথায় একটা সাপ জড়ান রয়েছে, এটা রাজমুকুটের চিহ্ন। বুঝা যাইতেছে যে সাপটি প্রাচীন রোমকদের কাছে একটা বিশেষ স্থান অধিকার কল্পিত। গ্রীকদের

যে প্রাচীন ঠাকুরের সমষ্টির প্রতিকৃতি আছে, তাহাতে দেখিয়াছি Jupitor, Juno, আরও অনেক ঠাকুর, একটা কুকুর ও grim ferryman Charon। এই ferryman Charon কুকুরটা 'ষ্টিক্স' (Styx) নদী পার করে দিত। আর একটা সাপ রহিয়াছে। সাপটা যে কি অর্থে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। একখানা বই-এতে পাওয়া যায় যে, Bacchanalian Orgies যখন গ্রীসদেশে ঢুকিল, তখন প্রাচীন দেবতা Dionysus নতুন নাম Bacchus পাইল। ইহাও উল্লেখ আছে যে আলেকজাণ্ডারের মা Olympia-তে রাত্রে ওই Bacchus পূজা করিয়া মদ খাইয়া এলোচুলে নাচিত। ওখানেও সাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই Bacchanalian Orgies-র পূজাকে গুজরাটে চলি পূজা বলে। চলি অর্থাৎ কাঁচুলি পূজা বলে। ইহার বর্ণনা লেখা উচিত নহে। বাংলাদেশে ঠিক সেইরূপ জিনিস ভৈরবীচক্র ছিল। কিন্তু গ্রীকদিগের Bacchus-এর পূজাতে সাপ কেন আসিল বুঝা যাইতেছে না। পুনিকদিগের Baal নামে এক পুরুষ-দেবতা ছিল, Ashtoreth স্ত্রী-দেবী ছিল। তাহাদের ভিতর এইরূপ Orgies বা চক্রের খুব প্রচলন ছিল। এবং সেই Phoenicianদের পূজা এখনও Mossul ও তন্নিকটস্থ স্থানে অদ্যাপি হইয়া থাকে। সেই সকল লোককে মুসৌরী অর্থাৎ Half Nassara বা Half Christian বলে।

আমি যখন কনস্টান্টিনোপলে ছিলাম, দেখিলাম গ্রীকরা সর্পকে সার্প বলে। যে বাটীতে ছিলাম সেই বাটীর একতলাতে বিকেলবেলা একটা সাপ বেরুল। সহরের বাটীগুলির অধিকাংশ কাঠের তক্তায় নির্মিত। পাকা ইটের বাড়ী খুব কম। আমরা এক গ্রীকদের বাটীতে ছিলাম এবং পাড়ার অধিকাংশ লোকই গ্রীক। কিছু পরিমাণ ইহুদীও ছিল। আমি আমার ভারতীয় সঙ্গীকে লইয়া সাপ

মারিতে একতলায় নামিলাম। এদিকে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা খবর পাইয়া কোমর পর্যন্ত জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল, "ওগো এরা কোন দেশী লোক, কি সর্বনেশে লোক যে ওদাবাসীকে মারে।" ওদাবাসী মানে গৃহবাসিত বাস্তু-সাপ, ক্রমে ক্রমে পাড়ার পুরুষরা জড় হইয়া সদর দরজা ভাঙ্গিয়া আমাদের মারিবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ আমার চোখ দরজার দিকে পড়ায় ব্যাপারটা দেখিলাম। তখন সঙ্গীকে বলিলাম, সাপ মারার আগে আমাদের মাথা যাবে, কাজ কি সাপ মেরে? আমরা উপরে থাকি, নীচের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নাই। উপরে আসিয়া দেখি রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, আর গ্রীকদেশীয় স্ত্রীলোকেরা চেঁচাচ্ছে আর গালমন্দ করছে। কোন রকমে তাদের মিষ্ট কথা বলে থামালাম। তখন রাস্তার লোক যে যার বাটী গেল। গ্রীকরা বাস্তু সাপ বা ওদাবাসীকে বিশেষ ভক্তি করে। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে যে প্রতি-মূর্তিতে সাপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, বোধহয় সেইটাই Snake-worship-এ (সাপপূজায়) পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশে আগে ঘরে বাস্তু-সাপ ছিল। বহুকাল ধরিয়া বাস করিত। সচরাচর কাহাকেও কামড়াইত না। সেই বাস্তু-সাপকে দুধ-কলা দেওয়া হইত। চলিত কথায় বলে, "দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা।"

পারশ্যদেশের ইস্‌পাহানে অবস্থানকালে একদিন ভূমিকম্প হইল, লোকেরা আমায় ভূমিকম্পের বিষয় বুঝাইতে শুরু করিল। পৃথিবীর নীচে একটা প্রকাণ্ড বড় সাপ আছে। তাহার অনেকগুলো মাথা। পৃথিবীটা একটা মাথাতে কিছুকাল রাখে, যখন ভার বোধ হয় তখন এক মাথা থেকে আর এক মাথায় পরিবর্তন করে; তাহাকে zul-zala (ভূমিকম্প) বলে। আমি চুপ করে শুনলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম যে আমাদের দেশেও ভূমিকম্পের এই গল্পটা আছে: ঠিক

একই গল্প। পারস্যে সাপকে "মার" বলে। এটা কি বৌদ্ধ শব্দ? (মোরস্ত পিস্‌ন্) অথবা বৌদ্ধদিগের মার কি পারস্যদেশের সর্পের নাম হইয়াছে?

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সাপকে দেবতা বলে পূজা হইত, এরূপ বিশেষ লক্ষিত হইতেছে না। প্রাচীনকালে যজ্ঞে ইন্দ্রদেবতা বা রুদ্র-দেবতার কথা পাওয়া যাইতেছে কিন্তু রুদ্রের গায়ে বা মাথায় সাপ আছে এরূপ ভাব স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয় না। পশুপতি বলে যে রুদ্রের রূপ আছে তাতেও সাপের বিশেষ উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রাচীনকালে রুদ্রের বা পশুপতির কাছে বলি হইত। তখন শক্তির ভাব প্রচলন হয় নাই এজন্য শক্তির কাছে বলির উল্লেখ পাইতেছি না। তাহার পর ভৈরবের অনেক উল্লেখ পাইয়াছি; বৌদ্ধ যুগের মধ্য ও শেষ অবস্থায় ভৈরবের পূজার প্রচলন হইয়াছিল এবং ভৈরবের কাছে বলির প্রচলন ছিল। ভৈরবের অনেক প্রস্তর মূর্তি এখন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সাপের চিহ্ন নাই। ভৈরবের বাহন কুকুর। যাহাদের আলেক বা অঘোরী বলে, উহারাই ভৈরবের উপাসক। বৌদ্ধ যুগের শেষ অংশ যাহাকে বামাচারী যুগ বলে, সেই সময় ভৈরবানন্দ সন্ন্যাসী এরূপ নামের বহু উল্লেখ আছে। তাহার পর একেবারে শিব আসিলেন এই শিবের মাথায় দেখিতেছি সর্প, কিন্তু যেরূপ দেখা যাইতেছে ইহাতে বোধ হয় শিবের ভাবটা অনেক পরে হইয়াছিল। বৌদ্ধ-গ্রন্থেই কেবল সাপের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার পর মহাভারতে সর্প-সত্র বা নাগ-যজ্ঞ। মহাভারতে প্রথমে উল্লেখ করিতেছে যে এই অংশটা প্রক্ষিপ্ত। বই নিজেই একথা বলিতেছে এবং সকল আভ্যন্তরিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতেই অনুমান হয় যে মৌর্যবংশের পর গুপ্তবংশের সময় তক্ষশীলা পরে রাওয়ালপিণ্ডের তক্ষকজাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং বহু তক্ষকজাতি কাটা গিয়াছিল। এই স্থানের

লোকেদের নাম হইতেছে তক্ষক, গক্ষর—এই সকল পার্বত্য জাতি মুসলমান হইলে গোক্ষর নামে অভিহিত হইত, যেমন হাসেন গোক্ষর। আকবর সেই সব নাম পরিবর্তন করিয়া ওয়াজীরি, আফ্রিদী এই সব নাম করিয়া দিলেন। মহাভারতে এক জায়গায় আছে যে কাশ্মীরে নাগ জাতির প্রাধান্য এবং অর্জুন নাগকন্যা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভারতে সেই স্থান পড়িলে বোঝা যায় যে, উলুপী গাড়োয়ালের কোনো রাজার মেয়ে ছিল, উহারা নাগ ছিল। লেপ্‌চা ডপ্‌পারাও নাগ ছিল। চলিত কথায় ইহারা অর্থাৎ নাগকন্যারা বা কাশ্মীরি স্ত্রীলোকেরা বড় সুন্দরী বুঝাইত। ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে নাগাসেরা বা (Nagas) একটা বড় রাজত্ব করেছিল। সম্ভবতঃ কুষ্ক, যুষ্ক ও কনিষ্ক—ইহারাও নাগ বংশের নাগ ছিল অর্থাৎ আফগানিস্থানের খানিকটা, হিমালয়ের খানিকটা এবং তাতার দেশের খানিকটা লইয়া একটা চক্র করিলে নাগরাজ্য হইবে। গুপ্তরাজাদের সহিত বোধহয় পেশোয়ারীদের যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে পেশোয়ারীরা হারিয়া যায়। তাহার পর General massacre of Nagas হয়। তাহার পর মহাভারত সংকলন কালে এই নাগবংশ ধ্বংসের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ মহাভারতের প্রথমে জন্মেঞ্জয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপাখ্যান পড়িলে ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। বাসুকী নাগ দিয়া যে সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল এটাও বোধ হইতেছে যে বৌদ্ধ যুগের গল্প। খুব প্রাচীন কালের গল্প বলিয়া বোধ হয় না। "ভুজঙ্গ পিহিত দ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি"—রঘুর এই শ্লোকটা মেসপারো (Mesparo) লিখিত Assyrian গ্রন্থে রহিয়াছে এবং পূর্বে বলা হইয়াছে অসুর রাজ্যে সর্প একটা শুভ চিহ্ন ছিল। এই সকল নানা রকম দেখিয়া অনুমান করা হয় যে সর্পপূজা প্রাচীনকালে আর্যদিগের ভিতর ছিল না। ইহা Assyrian-দের ও তাতারদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে এবং এই ভাবটা প্রাচীন বসিয়া পরিগণিত হইতেছে না যদিও এখন

ধর্মের একটা অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। মনসাপূজাটা গ্রাম্য বা প্রাদেশিক দেবতার পূজা, বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ এবং কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পুরাতন দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে না। লখিন্দরের গল্প এই মনসাপুজা সমর্থন করিতেছে, "যে হাতে পূজেছি আমি দেবী ভগবতী সেই হাতে পূজিব কিনা কানি চ্যাংবুড়ি?" 'কানি' ইত্যাদি শব্দে অবজ্ঞা প্রকাশ হইতেছে। বোধ হইতেছে এই উপাখ্যান রচনার কিছুদিন পূর্বেই মনসাপূজার প্রথম প্রচলন হয় এবং সেইজন্য প্রাচীন ভাব ও নব্যভাবে সংঘর্ষ হইতেছে।

দোল

আগে কলিকাতায় দোলটা খুব জাঁকিয়ে হ'ত। লোকে কথায় বলিত হিন্দুর বাটী, দোল-দুর্গোৎসব করতে হয়। দোল-দুর্গোৎসবে শাক্ত বৈষ্ণব ছিল না। সামর্থ্য অনুযায়ী উভয় দলই করিত। তখনকার দিনে দোলে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ছিল, বেশ নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। দোলে তত্ত্ব করারও প্রথা ছিল—চিনির মুড়কি, চিনির মঠ, ফুটকড়াই, কিছু আবির ও কুমকুম এই ছিল তত্ত্বের অঙ্গ। দোলের দিন আমোদ ছিল কোঁচড়ে চিনি মাখান ফুটকড়াই খাওয়া আর হাতে গায়ে আবির মেখে বেড়ান। এখন ফুটকড়াই, মুড়কি খাওয়ার তত প্রচলন নেই, মঠ তো প্রায় উঠে গেল। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে রং খেলা চলে দিনের বেলায়, এখন ম্যাজেণ্টার গুলে খেলে। তখনকার দিনে ম্যাজেণ্টার ছিল না, আমরা আবির গুলে খেলতাম। আর কুমকুম—শোলার গুটির ভিতর আবির পুরে মুখে মারিতাম। আগেকার দিনে চাঁচর ও মেড়াপোড়া হ'ত। আমরা বলতাম ভ্যাড়াপোড়া। বাঁশের গায়ে খড়ের ঘর মত করে মেড়া রেখে

পোড়াত। পূজা-পাঠ ঠিক আছে, তবে আমোদ এখন কমে গেছে। ম্যাজেণ্ডার দিয়ে লোকের জামা কাপড় নষ্ট করে দেওয়ার এই দুষ্টুমিটা বেড়েছে।

প্রশ্ন হইতেছে দোল বা হোলি খেলা বসন্তকালে কেন হইল এবং কবে থেকে ইহার প্রচলন হইল ? এই বিষয়ে জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে সেইজন্য এই স্থানে কিঞ্চিত আভাস প্রদত্ত হ'ল।

হোলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত "হল্লীসক্রীড়ম্"-এর অপভ্রংশ। আর্যজাতির ভিতর দেখা যাইতেছে যে প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ হইতে বসন্ত আগমনে মদনোৎসব প্রথা ছিল। তখনকার দিনে যেমন Asia বা Europe-এর অনেক স্থানে বরফ পড়িত, ভারতবর্ষেরও অনেক স্থানে সেইরূপ পড়িত। তুষারপাত অবসানে নূতন বসন্তের আগমনে সকলে আনন্দ করিত। ইহার বিশেষ নাম ছিল বসন্তোৎসব বা মদনোৎসব।

মদনোৎসব--Feast of Lupercalia

এই সময়ে সকলে সুরা পান করিত ও মাংস ভক্ষণ করিত এবং নানাপ্রকার আমোদ করিত। আর্যবংশীয়েরা পৃথিবীর যে যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানে এই মদনোৎসব প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন।

গ্রীকদের দেশে এই প্রথা পাওয়া যায়। Roman-রা ইহাকে Feast of Lupercalia বা Saturnalia বলিত। এই সময় পুরুষরা উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় ছোটাছুটি করিত ও অশ্লীল গান করিত সেইদিন ইহাতে কোন দোষ ছিল না। Roman স্ত্রীলোকদের ভিতর বিশ্বাস ছিল যে ঐ রকম অবস্থায় যদি কোন পুরুষ তিনবার বেত্রাঘাত বা

অপর কোন যষ্ঠির দ্বারা আঘাত করে তবে বন্ধ্যাত্ব দোষ নষ্ট হয়।

Shakespeare-এর নাটক Julius Caesar-এ এই feast-এর উল্লেখ আছে। Mark Antony বলিতেছে "You all did see that on Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. (Julius Caesar Act. III Sc. II)

জার্মানীদিগের ভিতর ঐ বসন্তোৎসব বা মদনোৎসবে যে-সব কাণ্ড করিত তাহা অতি আধুনিককালে আইন করিয়া ঐ বীভৎস ভাবটি বন্ধ করা হইয়াছে। France, Spain, Italy, Portugal, England প্রভৃতি দেশে King Carnival, Queen Carnival প্রভৃতি মদন-রতির উৎসব হইত এবং অদ্যাপি হইয়া থাকে। তবে গাল-মন্দ বীভৎস ভাবটা থাকে না, পারস্যদেশে উহাকে "আইদন ও রোজ" বলে। আকবর ইহা আগ্রাতে প্রচলন করিয়াছিলেন ও এই সময় মীনাবাজার খুলিতেন। বোম্বাইয়ের পার্শীরাও ইহা করিয়া থাকে। পারস্যদেশে Ispahan এ অবস্থান কালে দেখিলাম ইহা যথার্থই জাতীয় উৎসব। এগার দিন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করিয়া বাড়ি, ঘর-দোর পরিষ্কার করা হয় এবং পরস্পর নিমন্ত্রণ করা, দেখা-সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি। যদিও পারস্যদেশের লোকেরা এখন মুসলমান হইয়াছে, কিন্তু জাতীয় পুরাতন প্রথা এখনও রহিয়াছে। এই সময় বিশেষ করিয়া নানারূপ লটারী করিয়া ভাগ্য গণনা করিয়া থাকে। এই কয়দিন তাহারা প্রকাশ্যে মদ খাইবে, মোল্লার কথা মানিবে না। এই সময় নতুন কাপড় পরিবে ও আতর-গোলাপ মাখিবে এবং অবস্থানুযায়ী উত্তম আহার করিবে। পারস্যদেশের উপাখ্যান হইতেছে যে প্রাচীন রাজা জামসাদ্ এই প্রথা প্রবর্তিত করেন। ইহাকে নববর্ষের উৎসব বলে।

আর্যজাতি ছাড়া অন্য জাতির ভিতর এই মদনোৎসব আমি লক্ষ্য করি নাই। Semetic or Turanian-দের ভিতর এই প্রথা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। Dr Rajendra Lal Mitra-র "Introduction to the Antiquities of Orissa"—এই গ্রন্থে মদনোৎসবের অনেক উল্লেখ আছে। কর্পূরমঞ্জরী নামক গ্রন্থে এই মদনোৎসবের বিশেষ উল্লেখ আছে। (কর্পূরমঞ্জরী—"বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা" সংস্কৃত নাটক; রাজশেখর প্রণীত নাটকখানি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন)। এই নাটক এইজন্যই প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এই মদনোৎসব বা হোলি এখনও প্রবলভাবে রহিয়াছে এবং পশ্চিম অঞ্চলে ও বৃন্দাবনে ইহা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় দেখিয়াছি বৃন্দাবন ও অপর স্থানে লোকে অশ্লীল গান বড়ই প্রয়োগ করিয়া থাকে। দশকুমারচরিতে একটা উপাখ্যান পাওয়া যায়। (আচার্য দণ্ডি প্রণীত সংস্কৃত গদ্যকাব্য। দশটি কুমারের বিচিত্র জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।) সম্ভবতঃ উপাখ্যানের লোকটি ঋচিক মুনি, ইঁহার এক খুব বড় আশ্রম ছিল। সেখানে কয়েক সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অবশেষে এক বারবনিতা কুমারী আসিয়া সেই বৃদ্ধের আশ্রয় লইল এবং এইরূপ ভাবে সেই বৃদ্ধকে অভিভূত করিল যে তাহাকে লইয়া মদনোৎসব দেখিতে যাইল। উৎসব-মণ্ডপে রাজা ও রাণী বসিয়া আছেন। মন্ত্রী প্রভৃতি পারিষদগণ নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। এদিকে নট, নটী মদন ও রতি সাজিয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করিল। এমন সময় বৃদ্ধ ঋচিক মুনি বেশ্যা কুমারীকে লইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন এবং মদনোৎসব দেখিতে লাগিলেন। এই সব উপাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায় যে পুরাকালে মদনোৎসব ভারতবর্ষে খুব প্রচলিত ছিল।

পুরাকালে বিবাহের পূর্বে মদনপূজা ছিল। বিবাহার্থী কন্যা নূতন বস্ত্র পরিয়া, মাঙ্গলিক দ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সমবয়স্কা সখিগণ পরিবৃতা হইয়া, গ্রামের প্রান্তে এক প্রাচীন বৃক্ষতলে বা তরুগুল্ম মধ্যে মদনপূজা করিত। এই মদনপূজা করিলে অভিষ্টমত স্বামী পাইত। এই মদনপূজার কথা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু পরিশেষে ব্যাপার হ'ল পিতা এক পাত্রের সহিত বিবাহ স্থির করেছেন, কন্যা কিন্তু গোপনে অপর এক যুবককে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। এই যুবক ঘোড়া করিয়া আসিয়া, দূরে ঘোড়া রাখিয়া, স্ত্রীলোকের কাপড় পরিয়া কন্যাদিগের সহিত মিলিত এবং মদনপূজা করিতে অল্পদূর স্থানে যাইতেছে এইরূপ স্থির করিয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয়ে পলায়ন করিত কারণ এই সময় কন্যা-দিগের সহিত কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোক থাকিতেন না। এইজন্য এই পূজা পরে বন্ধ হইয়া যায়।

রোমিও এণ্ড জুলিয়েট-এতে (Romeo And Juliet) জুলিয়েট যখন গ্রাম্য পীরকে পূজা করিতে যাইতেছে, বৃদ্ধা nurse-কে রোমিওর কাছে পাঠাইতেছে, Friar Laurence-এর সহিত কথা কহিতেছে ও ডাক্তারখানা থেকে বিষ আসিতেছে ইত্যাদি এই সব দৃশ্য দেখান হইয়াছে। সব ব্যাপারটা ভারতবর্ষের এক কন্যা নিজের মনোমত পতির সহিত পলায়ন করিতেছে ঠিক যেন তাহার আভাস পাওয়া যায়। ইটালি দেশের ভিয়েনা নগরে এইরূপ প্রথা ছিল কিন্তু আর্য-জাতির সর্বত্রই আচার-ব্যবহারে অনেক ঐক্য আছে তাহা বেশ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। অদ্যাপি ভারতবর্ষের অনেক গ্রামে বিবাহের পূর্বে গ্রাম্য দেবতার পূজার প্রথা আছে অর্থাৎ গ্রামের প্রান্তে নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিয়া আসে। ইহা হইতেছে প্রাচীন মদনপূজার রূপান্তর।

কন্দুক ক্রীড়া

এই মদনপূজার সংশ্লিষ্ট আর একটি প্রাচীন ব্যাপার ছিল ইহাকে বলিত কন্দুক ক্রীড়া। কন্যকা (Damsels) নব-বসন ও দুকূল পরিধান করিয়া বিবাহের পূর্বে বা অন্য কোন শুভ দিবসে সমবয়স্কা সখিগণ লইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে যাইয়া নাট মন্দিরে কন্দুক ক্রীড়া করিত। এক হইতে তিন, পাঁচ, সাত পর্যন্ত ভাঁটা শূন্যে নিক্ষেপ করিত এবং বাদ্যের সহিত তাল মান রাখিয়া নানাভাবে নৃত্য করিতে করিতে শূন্য হইতে পতিত ভাঁটা সকল গ্রহণ করিত এবং পুনরায় শূন্যে নিক্ষেপ করিত। প্রাচীন গ্রন্থে এই কন্দুক ক্রীড়ার বহু প্রশংসা ও বর্ণনা আছে। নৃত্যের সহিত দুকূল উড়িত এবং বসনও বায়ুভরে স্ফীত হইয়া নানাভাবে দুলিত। হস্ত সঞ্চালনের এবং পদ-বিক্ষেপের বিশেষ পটুতা ছিল। এই সময় অনেক কুমারীর নাম "কুন্দুকবতী" পাওয়া যায় ; এখন অপভ্রংশ হইয়া "কুন্দনী" হইয়াছে। পুরুষদিগের নাম যে "কুন্দনলাল" তাহাও সম্ভবতঃ এই শব্দ হইতে হইয়াছে। ঐ ক্রীড়ার স্থান নির্দেশ হইত বিন্ধ্যবাসিনীর নাটমন্দির। এই সময় কালী ও বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির অনেক হইয়াছিল। কন্যা অনেক সময় মনোমত পতির সহিত পলায়ন করিত। সম্ভবতঃ এই কন্দুক ক্রীড়া মদনোৎসবের অংশ ছিল।

চড়কপূজার উৎপত্তি

পূর্বে চড়কের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে (পৃঃ ৫৪ দ্রষ্টব্য) সেটা শুধু প্রচলিত ব্যাপারের বর্ণনা মাত্র কিন্তু এই পূজার উৎপত্তির বিষয় বলা হয় নাই। সেই উৎপত্তির কথা এস্থলে বলা হইতেছে। কোন প্রাচীনগ্রন্থে চড়কপূজা বলিয়া প্রথা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার শুধু

বাংলাদেশেই প্রচলন; উত্তর-ভারতে কখনও দেখি নাই এবং দক্ষিণে, মাত্রাজে আছে কিনা তাহাও ঠিক জানা নাই। তবে দেখা যায় একটা শিবের গাজন হইত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা—হাড়ি বাগ্দীরাই করিত। যাহোক উচ্চবর্ণের লোকেরা কখনও চড়কগাছে ঝোলে না বা পিঠে কাঁটা ফোঁড়ে না। এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ-ধর্মের অবসানে যখন ধর্মঠাকুরের অভ্যুত্থান হইল তখন নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের প্রচলন হইল এবং সম্ভবতঃ এক মাসের জন্য সন্ন্যাসপূজা গ্রহণ করা ও কঠোর সাধনা করার এক প্রথা উঠিল। পুরাণ তৈয়ারী করিতে বিশেষ পরিশ্রম লাগে না. একটা গল্প তৈয়ারী করিয়া দিলেই হইল আর প্রথম পাতায় লিখে দাও স্বয়ং ব্যাস এসে বলেছে। এই করিয়া অনেক পুরাণ তৈরী হয়েছে ও হইবে। ধর্মঠাকুরের পূজার ভিতর এই চড়কপূজা আসিবে। সম্ভবতঃ ইহা নিম্নশ্রেণীর পূজা, ধর্মঠাকুরের এক পুরাতন ছড়া আছে,

"ধর্মঠাকুর যেটা, সেটা ফিরিঙ্গী কি গোরা,
বামুনের হাতে খায় না পূজা, পূজুরী তার ডোম বেটারা।"

হাড়ীদের ভিতর একটা পূজা আছে মহাকাল বা এইরূপ এক নামে। তারা শোর বলি দেয় ও মদ দেয়: বোধ হচ্ছে সেটা ধর্মঠাকুরের পূজারই এক রূপান্তর।

দুর্গাপূজা

আমরা শৈশবে দেখেছি যে কলিকাতায় অনেক বাটীতে দুর্গাপূজা হইত। শাক্তের বাটীতে দুর্গার সিংহ সাধারণভাবে এবং গোঁসাই-এর বাড়ীতে সিংহ ঘোড়ার মত মুখ হইত। সম্ভবতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের ভিতর এই প্রভেদ রাখিত। অপর বিষয় সব একই হইত। প্রতিমার আয়তন এক এক বংশে এক এক প্রকার আছে। বড়-

বাজারের এক বাড়ীর প্রতিমা সর্বাপেক্ষা ছোট হইত। তাহাকে আমরা পুতুল দুর্গা বলিতাম। আমরা যখন শিশু, তখন ডাকের গহনা উঠে নাই, মাটির গহনা হইত। সে বেশ সুন্দর ছিল। অল্প দিনের পর ডাকের গহনা উঠিল ও মাটির গহনা কমিয়া গেল। দুর্গা-পূজায় বেশ একটা ভক্তির ভাব ছিল। বিশ্ববরণ রাত্রে হইত। নব-পত্রিকার স্নান হইতে শুরু করিয়া খুব একটা আনন্দ স্রোত বহিত। সন্ধিপূজায় দীপমালা হইত এবং অনেক স্ত্রীলোক হাতে বা মাথায় সরা করিয়া ধুনা পুড়াইত। সে-সব মানসিক ব্রতের ভিতর ছিল। অনেকে সন্ধি পূজার সময় নাপিত দিয়া বুক চিরিয়া রক্ত সোনার বা রূপার বাটি করিয়া পূজা দিত। তবে এটা খুব কম ছিল। কলি-কাতায় শহরে অনেক বাটীতে বলি ছিল না। শাক্ত হইলেও বংশ-পরম্পরায় বলি নিষেধ ছিল। কোন কোন বাটীতে বলি হইত। বিশেষ আমোদের ছিল নীল মাখান কোরা কাপড় পরে ঢুলীদের বাজনার সঙ্গে ছেলেদের নাচা। তখনকার দিনে নীল রং মাখান কোরা তাঁতের কাপড়ই ছেলেদের ভিতর বেশী প্রচলিত ছিল। ধোয়া কাপড় বয়োজ্যেষ্ঠরা পরিত। "কাঁইনানা, কাঁইনানা, গিজদা গিজোর, গিজোড় গিজোড়"—আর ছোট ছেলেরা দু'পাছা চাপড়াইয়া নাচিত। তারপর ঢুলিদের আর একটা বোল ছিল—"দাদাগো দিদিগো গাবতলাতে গরু দেখ্‌সে; গরু গরু গরু গরু তার দেখব কি আর।" তখনকার দিনে দুর্গাপূজা হ'লে দশজনকে পাত পাড়াতে হ'ত। ব্রাহ্মণের বাটী হলে ভাত, পাঁচ তরকারী, দই, পায়েস। শাক্ত ব্রাহ্মণ হইলে মাছ চলিত, কায়েস্থের বাটীতে লুচি চলিত। যাহোক সাদামাটা খাওয়ান হইলেও সকলকে খাওয়ান চাই। তবে বামুন বাটীতে শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট যা হইত অতি উপাদেয় হইত কারণ বাড়ীর মেয়েরা রাঁধিত। সন্ধ্যার সময় ঝি, চাকর, ছেলে মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে গেলে এক সরা করে জলপান দেওয়ার

প্রথা ছিল। যাহোক দুর্গাপূজার সময় সকলকে মিষ্টি মুখ করান হ'ত।

বিজয়ার দিন পাড়ার বুড়ো ব্রাহ্মণদের কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া প্রণাম করিতে হইত। বিজয়ার দিন নারিকেলছাবা দেওয়া হইত। বিজয়ার কোলাকুলিতে সন্দেশ বা অন্য কোন খাবার চলিত না। কিন্তু সংস্কার এমন জিনিস যে, এখন পর্যন্ত নারিকেলছাবা দেখিলে বিজয়ার রাত্রি মনে পড়ে।

তখনকার দিনে অনেক ভট্টাচার্য বামুন বার্ষিকী পাইতেন। এখন সেটা উঠিয়া গিয়াছে। বিজয়ার রাত্রে পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া কোলাকুলি করিতে হইত। এখন যেমন মাসে-মাসে লোকজনের টাকা চুকাইয়া দেওয়া হয় আগে তেমন ছিল না। কথায় ছিল ঢাকে-ঢোলে অর্থাৎ দুর্গাপূজায় এবং চড়কে লোকে দেনা চুকাইয়া দিত। তখন মুদীর দোকান থেকে উট্‌নো নেওয়ার প্রথা ছিল। সেটা বছরে দুবার পরিশোধ হইত। সর্ব বিষয়ে তখন দুর্গাপূজায় মহা আনন্দের ভাব ছিল। এমন কি গ্রাম্য মুসলমানরা আসিয়া প্রতিমাকে তিনবার সেলাম সেলাম সেলাম বলিয়া চলিয়া যাইত। যাহাদের বাড়ীতে প্রতিমা না আসিত, তাহারা কয়েকদিন চণ্ডীপাঠ করাইতেন। এইটা ছিল তখনকার দিনের জাতীয় উৎসব। হিন্দুমাত্রই তখন আনন্দে মাতিয়া উঠিত—এই হইল ভক্তিভাব ও জাতীয়ভাব।

বাংলাদেশে প্রচলিত যেসব দুর্গাপূজার গল্প পাওয়া যায় তাহাতে রাবণ বধার্থে রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণে বা অন্য কোথাও নাই। কথক ও তৎশ্রেণীর লোক আধুনিক যুগে এই সব রচনা করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে, চণ্ডীগ্রন্থ কবে রচিত হইল। মধুকৈটভ বধের পঞ্চম শ্লোকে আছে "বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা।" কোলা মানে—শুকর

খায় না এমন যবনরা আসিয়া আক্রমণ করিল। ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, মুসলমান আক্রমণের প্রারম্ভেই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। যদি ১০০১ খৃঃ অব্দে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় তাহা হইলে চণ্ডীগ্রন্থ রচনা তাহার পরে হইয়াছে। যদিও গল্পটা প্রাচীন হইতে পারে।

মহিষাসুর বধ

রামায়ণে পাওয়া যায় যে, রামের সহিত সুগ্রীবের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে তখন সে বলিতেছে তোমার বাহুবল পরীক্ষা করিব। যদি এই মহিষের অস্থি দূরে নিক্ষেপ করিতে পার ইত্যাদি। এবং সেই স্থলে মহিষাসুর বধের একটি গল্প আছে। কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায় যে কার্তিকেয় (দেব সেনাপতি) মহিষাসুর বধ করিয়াছেন এবং কোন স্থলে এইরূপ আছে যে, দেবী মহিষাসুর বধ করিয়াছেন। অবশ্য একটা পূর্বের ও একটা পরের লেখা। গ্রীকদের বইতে এইরূপ Hydra বধ করার গল্প আছে এবং এই Buffalo demon বধ করার কথা অনেক প্রাচীন জাতির গল্পের ভিতর আছে। সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে দেখা যাইল যে, South Africa-র এক স্থানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে অতি নিম্নস্তরে একটা প্রকাণ্ড মহিষের কঙ্কাল ও তাহার পার্শ্বে একটা মানুষের কঙ্কাল দেখা যাইল, বোধ হইতেছে পরস্পর আহত হইয়া উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যাহা হউক এই মহিষের কঙ্কাল অতি বৃহৎ। প্রাচীনকালে পৃথিবী অরণ্যে আবৃত ছিল; বাস উপযোগী অল্প স্থান ছিল। এই অরণ্য পরিস্কৃত হইতে লাগিল এবং বাসভূমিও প্রসারিত হইতে লাগিল। তখন মহিষের সহিত সর্বদাই সংঘর্ষ বাধিত এবং অরণ্য-মহিষ বধ করা একটা বিশেষ কাজ ছিল। এই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানাপ্রকার উপাখ্যান রচিত হয়েছে, ইহাকে Aryan mythology বলে।

ইহা পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যে আছে। আমেরিকাতে বাইসন বড় বেশী ছিল। বাইসন মারিতে মারিতে প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন অল্প মাত্র আছে। এইরূপ এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকাতে মহিষের বড় উৎপাত ছিল। সেইজন্য সাধারণ লোক দেবতা বা দেবীর আরাধনা করিত, যাহাতে মহিষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মহিষকে অসুর আখ্যা দেওয়া হয়েছে—Buffolo demon. প্রাচীন গ্রন্থে উমা-হৈমবতীর গল্প আছে। তাহা অন্য ভাবের, মহিষ বধের সহিত কোন সংশ্রব নাই। প্রাচীন প্রস্তরে মহিষমর্দিনীর যে প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে একটি স্ত্রীলোক বর্শা দিয়া একটি মহিষ মারিতেছেন। সিংহ বা পার্শ্বদেবতা নাই। হাত দুইটা মাত্র।

আসিরিয়া ও বাবিলোনীয়াতে দেবতাদিগের মাহাত্ম্য সূচনা করিবার জন্য তদ্দেশীয় শিল্পীরা মাহাত্ম্য-সূচক পক্ষ যুক্ত করিল। যেমন,—winged horse, winged lion, winged man ইত্যাদি। আসিরিয়াতে একটা প্রস্তর মূর্তি পাওয়া যায়, সেটার পাখীর মত ঠোঁট, মনুষ্যের মত মুখ ও শরীর, পিছনে দুটো ডানা, জোড় হাত করে রয়েছে। ঠোঁট বাদ দিলে এই জীবটা ইহুদীদিগের Angel-এ পরিণত হয় এবং পারস্যদিগের পরী হয়। "পর" মানে পক্ষ ভারতবর্ষের ছোটদের গল্পে যদিও পরীর উল্লেখ আছে, কিন্তু ডানাবিশিষ্ট দেবতা ভারতবর্ষে নাই। কারণ সিদ্ধপুরুষরা নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তিতে স্বর্গে গমনাগমন করিতেন, ডানার আবশ্যক ছিল না। এই ডানা যোগ করা আসিরিয়ানদের দ্বিতীয়কালে পাওয়া যাইতেছে প্রথমকালে এই রূপ ছিল না।

ভারতের আর্যদিগের দেবমূর্তিতে প্রথমতঃ দুই হাত পরে মাহাত্ম্য বিস্তারের জন্যে ষড়ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজ পর্যন্ত হইল। আসিরিয়ানরা ও ভারতীয়রা দেবতাদের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্যে

ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাহার পর এই মাহিষমর্দিনী চার হাত বিশিষ্টা হইলেন। তখনও পর্যন্ত বাহনের কোন কথা নাই। বাহন পরে হইয়াছিল। প্রত্যেক দেবতার এক একটি বাহন স্থিরীকৃত হয়েছিল। যথা বায়ুর বাহন হরিণ; গঙ্গার মকর ইত্যাদি। ক্রমে দেবতা হইতে বাহনের সম্মান বেশী হইল, এবং বাহুর সংখ্যা বাড়িল। তারপর দেশে এক ভাব উঠিল পার্শ্বদেবতা চাই। প্রত্যেক দেবতার পার্শ্বদেবতা হইল। এই সকল বৌদ্ধ-দিগের শিল্পনৈপুণ্যের কথা। এইরূপ মহিষমর্দিনীর একটা বাহন হইল সিংহ এবং নিজেও অষ্টভুজা হইলেন। কাশ্মীর শ্রীনগর শহরে হরিৎপর্ব্বত (হারাপর্উত) দুর্গের মধ্যে এক অষ্টভুজার মন্দির আছে। এই অষ্টভুজা এক প্রস্তরের উপর খোদিত। সব সময় একখানি বস্ত্র দ্বারা আবরিত থাকে। পূজার সময় মহারাজ যেদিন দেখিতে যান, সেই দিন বস্ত্র উত্তোলন করা হয়; এইজন্য ভিতরে কেমন আকৃতি দেখিতে পাই নাই। বৃদ্ধ পুরোহিত আমাদের বলিলেন যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় তাঁর পিতামহ তাঁর পুরোহিত ছিলেন। রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর জয় করিয়া ৬০ হাজার কাবুলী বলি দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ যেমন শুনিয়াছিলেন সেই অনুযায়ী আমাদের সকল স্থান দেখাইলেন ও গল্পটি বলিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উপরকার ডান পার্শ্বে এক চণ্ডীর প্রস্তর মূর্তি আছে। এইরূপ সুন্দর মূর্তি খুব কম ভাস্করই করিতে পারে। তাহাতে চার হাত নাই, দুই হাত এবং বাহন বা পার্শ্বদেবতা নাই। এই চণ্ডীর মূর্তি অতি বিখ্যাত মূর্তি। শিল্পীরা এই মূর্তির বিশেষ প্রশংসা করেন। তারপরে বিন্ধ্যাচলে অষ্টভুজার পাহাড়ে এক অষ্টভুজার মূর্তি আছে। অনেকদিন আগে দেখিয়াছি, পুঙ্খানুপুঙ্খ ঠিক মনে নাই। জয়া বিজয়া নামে দুই পার্শ্বদেবতা আছে। চারটি পার্শ্বদেবতা নাই। পদতলে বাহন আছে কিনা ঠিক মনে নাই। ইহাকে অষ্টভুজা বলিয়া থাকে।

বাংলার দুর্গা দশভুজা. বাহন ও চারিটি পার্শ্বদেবতার প্রচলন, বর্ণ স্থানে স্থানে পৃথক হয়। চিত্রকলার নিয়ম অবলম্বন করিলে বাহন ও চার পার্শ্বদেবতার প্রচলন পরবর্তী সময় হইয়াছে। ইহা অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

চিত্রকলার নিয়ম অনুসরণ করিলে দেখি যে, দুর্গার কোমর বাঁকা, সিধা নয়। যেমন প্রাচীন প্রস্তরে মহিষমর্দিনী বা অন্য দেবতা সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বাংলার দুর্গা বা কৃষ্ণের কিন্তু কোমর বাঁকা। জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণা ইহাদের কোমর বাঁকা নয়। বৌদ্ধদিগের শেষকালে এক রকম শিল্পনৈপুণ্য উঠিল তাহাকে three block system তিন টুকরো মূর্তি (ত্রিভঙ্গ) বলে। পুরুষ হইলে ডানদিকে কোমর বাঁকাইল, স্ত্রীলোক হইলে বাঁদিকে কোমর বাঁকাইল। বুদ্ধ ও যশোধরার প্রতিকৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধের কোমর ডানদিকে ও যশোধরার কোমর বাঁদিকে বাঁকা। সাধারণ শিল্পী এ-প্রথা পছন্দ করিল না। কাজেই এ-প্রথা উঠিয়া গেল। পশ্চিম অঞ্চলে বা উড়িষ্যাতে এই three block system দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই প্রথার চিহ্ন-স্বরূপ বাংলায় দুটো মূর্তি রহিয়াছে। বাংলার কৃষ্ণের ডানদিকে কোমর বাঁকা। বাংলার দুর্গার বাঁদিকে কোমর বাঁকা। এইসব কারণে অর্থাৎ দশহাত, বাহন, পার্শ্বদেবতা ও বাঁকান কোমর এইসব সম্মিলিত করিলে এইরূপ অনুমান হয় যে প্রচলিত বাংলার দুর্গা ঠাকুর সাত আট শত বৎসরের অধিক হইবে না। ইহা একটি বিশেষ গবেষণার বিষয়। পৌরাণিক ব্যাখ্যা নানারূপ হইয়া থাকে, ইহা ধর্তব্যের বিষয় নহে। খুব আধুনিক চিত্রকলার প্রথা ধরিলে ইহা আধুনিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

দুর্গাপূজা হইতেছে নবপত্রিকার পূজা অর্থাৎ worship of the green harbage। আর একটা ভাব আছে, যেটাকে কলা-বৌ

বলে, এইটাই এই নবপত্রিকা। এটা বসন্তকালেও হ'তে পারে আবার শরৎকালেও হ'তে পারে। এজন্যে এই পূজা দু'বার হয়। আগে কলিকাতায় বাসন্তীপূজা হইত এখন প্রায় কমিয়া গিয়া অন্নপূর্ণা-পূজা প্রচলিত হইয়াছে। চিত্রকলা অনুযায়ী দেবীনেত্র বা দুর্গানেত্র অতি বিখ্যাত। বিশেষত্ব এই যে, প্রাঙ্গনের যেখানে যে থাকুক না কেন সকলেই বলিবে দেবী তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। উহাকে বলে দেবীনেত্র। বাংলাদেশে হইতেছে পদ্মনেত্র। ইহাই চলিত নেত্র। মাদ্রাজে মীননেত্র আছে। যাহোক কলাবিদ্যা অনুযায়ী সকল প্রকার প্রতিমা হইতে দুর্গা প্রতিমার মূর্তি শ্রেষ্ঠতম ও অতি উচ্চ শ্রেণীর। শিল্পীর মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং পূজা পাঠও অতি সুন্দর। তবে ইতিহাস অন্য জিনিস, বড় নীরস।

পুরাতন প্রস্তর মূর্তিতে ছটা বা চালচিত্র পাওয়া যায় না। এই halo বৌদ্ধযুগের শেষভাগে হইয়াছে। প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিতে বিশেষ নাই। তবে শেষভাগের প্রস্তর মূর্তিতে আছে। উড়িষ্যার মূর্তিতে চালচিত্র বা ছটার প্রচলন নাই।

শালগ্রামপূজা

আগেকার দিনে কলকাতার বাসুন্দেরা এইখানকারই লোক ছিলেন। গ্রামদেশে তাহাদের বাটী বড় ছিল না। এইজন্যে ব্রত-নিয়মাদি সকলেই নিজের বসতবাটীতে করিতেন। কিন্তু এখন অনেকেই বিদেশী লোক, কলিকাতায় বাসা-বাড়ী এবং গ্রামদেশে পৈতৃক বসতবাটী। এজন্যে ব্রত-নিয়মাদি সকলেই গ্রামের পৈতৃক ভিটায় করেন। কলিকাতায় অল্পমাত্র এবং অপরিহার্য ব্রত-নিয়মাদি করেন।

তখনকার দিনে সকল বাটীতেই শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ

ছিল এবং এক পুরোহিত আসিয়া বা যাজক ব্রাহ্মণ সকাল সন্ধ্যায় পূজা করিয়া যাইতেন। যেদিন যাজকের আসিতে বিলম্ব হইত, সেদিন বাটীর গিন্নীরা আহার করিতে বিলম্ব করিতেন। বাটীতে ঠাকুরকে উপবাসে রাখিয়া বাটীর গিন্নীরা আহার করিতেন না; পাড়ার কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে ডাকিয়া পূজা করাইয়া লইতেন। বাঙালীর সমস্ত পূজা ব্রত-নিয়মাদি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শালগ্রাম বা নারায়ণ পূজা হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কাহাকেও দিয়া এই পূজা করান হয় না।

শিবপূজা যে যার নিজে করিতে পারেন। তন্ত্রমতে পূর্ণাভিষিক্ত হইলে নিজের ইষ্ট কালীপূজা ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরেও করিতে পারেন। তাহাতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু শালগ্রামপূজা বিষয়ে মহা তর্ক-বিতর্ক উঠিবে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কাহারও এ পূজায় অধিকার নাই। ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অপর কথা, বাংলার বাহিরে অন্য সব স্থানে দেখিয়াছি যে শালগ্রামপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। তবে বাংলার মত এত জোর প্রচলন আছে কিনা ঠিক জানি না। কারণ পশ্চিমের অধিকাংশ লোক রামাইত বৈষ্ণব বা শ্রী সম্প্রদায় ভুক্ত। তাহারা রামসীতার পূজা করিয়া থাকে। শক্তির উপাসক খুব কম। কিন্তু তাহা হইলেও অনেক স্থলে শালগ্রাম শিলার পূজা হইয়া থাকে। এই শালগ্রাম-পূজাটা কি এবং কবে থেকে ইহার প্রচলন হইল?

প্রাচীন গ্রন্থে শালগ্রাম শিলা বলিয়া কিছু পাওয়া যায় না। বৈদিক কালে নানা দেবতার হোম করিবার প্রথার প্রচলন ছিল। বৌদ্ধদিগের সময়ে এই হোম করার প্রথা উঠিয়া গেল এবং বুদ্ধপূজা আরম্ভ হইল। পরে বুদ্ধের নানারূপ নানাভাব বহুতর হইতে লাগিল। বহু প্রকারের নরক আছে মনে হইতেছে ৬৪ প্রকারের এবং সেই সকল নরকে জীবের কিরূপ যন্ত্রণা হয়

তাহাই মন্দিরের গায়ে বা চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে দেখান হইত এবং সন্ন্যাসী বাবাজী ও ভিক্ষু মহাশয় এইরূপে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। যুধিষ্ঠিরের সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাগ্নিক ও নিরগ্নিক দুই প্রকার ঋষি ছিলেন। এক শ্রেণী অগ্নির উপাসনা করিতেন, অপর শ্রেণী অগ্নির উপাসনা করিতেন না। এইরূপ অনুমান করা যায় যে, অঙ্গিরা অগ্নির পূজা প্রণয়ন করেন, সেইজন্য সেই প্রথাবলম্বী ঋষিরা সাগ্নিক হইলেন কিন্তু পূর্বমতাবলম্বী ঋষিরা বিদ্যমান ছিলেন তাহারা নিরগ্নিক হইলেন। যাহা হউক, কালক্রমে সাগ্নিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং নিরগ্নিকের সংখ্যা কমিয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধের অভ্যুত্থানে নিরগ্নিকের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পাইল। বুদ্ধ নিরগ্নিক, শঙ্কর নিরগ্নিক, চৈতন্য নিরগ্নিক কিন্তু তন্ত্র সাগ্নিক। তন্ত্র দাবী করিল যে, তাহারা প্রাচীন বৈদিক মতের প্রচলন করিতেছে, কেবলমাত্র সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিতেছে। এইজন্য তন্ত্রোক্ত প্রকরণে বা বৈদিক প্রক্রিয়াতে হোমের আবশ্যক হয় যথা উপনয়ন, বিবাহ, বৃষোৎসর্গ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে হোমের আবশ্যক হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী আবার সাগ্নিক মতের প্রচলন করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ নিরগ্নিক মত অবলম্বন করিলেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে কখনও সাগ্নিক মত প্রবল হইতেছে, কখনও নিরগ্নিক মত প্রবল হইতেছে কিন্তু কোন মত একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

প্রাচীন গ্রন্থে হিরণ্যগর্ভের উপাখ্যান পাওয়া যায়। আর্যসমাজ-পন্থীরা এই হিরণ্যগর্ভের স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে লেকচার-কালে এই হিরণ্যগর্ভ (Golden Embryo) বিষয় লেকচার দিয়েছিলেন। (লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ দ্রঃ) যেরূপ অনুমান করা যায় তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে অব্যক্ত ও ব্যক্ত এই দুইয়ের

মধ্যবর্তী স্থলকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। অব্যক্ত বা শক্তিপুঞ্জ সাম্যভাবে রহিয়াছে। কিন্তু অচিরে বিকাশমুখীভাব আসিল, বিকাশ হইলেই খণ্ডত্ব আসিবে। এই দুই ভাবের সংমিশ্রণ-কেন্দ্রকে হিরণ্যগর্ভ বলিতেছে। যতদূর অনুমান করা যায় পৌরাণিক গ্রন্থে এইরূপ ভাব রহিয়াছে। অবশ্য নানা ব্যক্তি নানা-ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, সেকথার এস্থলে আবশ্যক হইতেছে না।

বৌদ্ধযুগে প্রথম বিগ্রহপূজা আরম্ভ হয়েছিল। "বিনয়পিটকে" আছে যে, বুদ্ধ একবার শ্রাবস্তি হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। শ্রাবস্তি বর্তমান বস্তী, অযোধ্যার অপর পার। বুদ্ধের এক বৈশ্য শিষ্য ছিলেন, তিনি প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। কিন্তু বুদ্ধ স্থানান্তরে যাওয়ায় শূন্য আসনকে প্রণাম করিতে তাহার মনে তদ্রূপ শান্তি আসিত না, সেইজন্য তিনি চন্দনকাঠে বুদ্ধের প্রতিরূপ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া নিত্য প্রণাম করিয়া যাইতেন। সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম বিগ্রহ পূজার সূত্রপাত। কিন্তু বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাব অস্তমিত হইবার পূর্বে পৌরাণিক সম্প্রদায় উঠিল। মৌর্যবংশের অবসানের পর যখন গুপ্তবংশ উঠিল তখন হইতেই পৌরাণিক ভাব উঠিতে শুরু করিল, যেমন পাটলিপুত্র নাম হইল পুষ্পপট্টন সংক্ষেপে পট্টন বা পাটনা। শ্রমণ বা ভিক্ষুকদিগের নাম হইল নগ্ন ক্ষপণক। এবং যত গালিগালাজ সমাজের দুষ্ক্রিয়া, এই নগ্ন ক্ষপণকদিগের সঙ্গে সংযোজিত হইল। এই সময় হিরণ্যগর্ভের ভাবটি সাধারণের মধ্যে প্রচলন করিবার প্রয়াস উঠিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে এই গোলাকৃতি শিলাখণ্ড হিরণ্যগর্ভের প্রতিকৃতি বলিয়া পরিগণিত হইল এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ বলিয়া তাহার পূজা আরম্ভ হইল। নারায়ণ-পূজাতেও দেখিতেছি চতুর্বাহু সংযুক্ত এক জ্যোতির্ময় পুরুষ উদ্ভূত হইতেছে।

পৌরাণিককাল হইতে সম্ভবতঃ এই শালগ্রাম শিলার প্রচলন হইয়াছে এবং বৈদিককালের হিরণ্যগর্ভের সহিত সংমিশ্রণ থাকায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহাকেও পূজা করিতে দেওয়া হয় না। সম্ভবতঃ শালগ্রামের ইহা হইতেই উৎপত্তি এবং অপর কিছু উৎপত্তির কারণ থাকিতে পারে কিনা এবং তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়।

বাণলিঙ্গ মহাদেব

বাণলিঙ্গ মহাদেব একটি ছোট স্ফটিক প্রস্তরের বিগ্রহ। সাধারণের ধারণা এই যে, গৃহস্থের এই বাণলিঙ্গ মহাদেব পূজা করিতে নাই। কেবলমাত্র সন্ন্যাসীরা এই শিবপূজা করিতে পারেন। বাংলাদেশে বাণলিঙ্গের প্রচলন নাই। কাশী অঞ্চলে দেখিয়াছি অতি অল্প গৃহস্থের বাটীতে এই শিবলিঙ্গ আছে এবং যে যার ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু এর প্রচলন অতি অল্প লোকের মধ্যে।

গণিত শাস্ত্রে দেখিয়াছি যে সংখ্যা গণনা হইতেছে ০,১,২,৩···০ ইত্যাদি। আসিরিয়ান সংখ্যা ছিল ১ হইতে ৬০ ইহাকে Hexa Desimal System বলিত। রোমানদিগের I V C D এইরূপ বর্ণ দিয়া সংখ্যা নির্ণয় করা হইত। আরবদিগের প্রাচীনকালে রোমান প্রথা অনুযায়ী সংখ্যা নির্ণয় করা হইত। এইজন্য ০, ১, ২, ৩-কে হিন্দু-প্রথা বলা হইয়া থাকে। এই প্রথা কেন আর্যেরা প্রণয়ন করিলেন ইহাই হইল বিচার্য বিষয়। অব্যক্ত শূন্য বা পূর্ণ হইতে তদন্তর যখন দেশ কাল ও নিমিত্ত জ্ঞান আসিল, অব্যক্ত যখন ব্যক্তমুখী হইল তখন অহং বা একং বা Monad আসিল। এই মোনাড আসিলেই দুই তিন বহু হইয়া থাকে এবং পুনরায় সেই অব্যক্তে বা শূন্যে বা পূর্ণে মিশিয়া যায়। এই শূন্য বা পূর্ণ যাহা দেখিতেছি অর্থাৎ

ডিম্বাকৃতি, ইহা হইতেছে নির্গুণ গুণময়। নিজে নির্গুণ কিন্তু অপর সংখ্যার পরে থাকিলে তাহার গুণ প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন দুই-এর পরে থাকিলে ২০ হয়। তিনের পরে থাকিলে ৩০ হয় কিন্তু পূর্বে থাকিলে কোন হ্রাসবৃদ্ধি নেই।

যদি অহং বা দ্রষ্টা রহিল তাহা হইলে দৃষ্টি ও দ্রষ্টব্য আসিল এইজন্য বহুধা হইল। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে যথা $0-0=0, 0\div 1=0, 1\div 0=$ Infinity, এই তো হল গণিত শাস্ত্রের ব্যাপার। এখন দেখিতেছি বাণলিঙ্গ ডিম্বাকৃতি এবং শূন্যের প্রতীক। ইহাতে গৌরীপট্ট নাই। শিব ও শক্তির ভাব ইহার ভিতর নাই; প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিশ্রণে যে সৃষ্টি হইয়াছে ইহা সে ভাবও নহে। ইহা নির্গুণ অব্যক্ত অবস্থার প্রতীক। জ্যোতির্ময় মহাব্যোমের অনুরূপ। এখনও খণ্ড, সগুণের ভাব আসেনি, এইজন্য গৃহস্থকে এই বাণলিঙ্গ মহাদেবের পূজা করিতে নিষেধ করা হয়। সন্ন্যাসীরা লক্ষ্মীছাড়া পথে ঘুরে বেড়ায় তাই তাদের পূজা করিতে নিষেধ করে না। বাণলিঙ্গ মহাদেব—হরিবংশে উষাহরণ অধ্যায়ে বাণ-যুদ্ধের কথাতে আছে। ইহা পৌরাণিক ও আধুনিক। ভারতবর্ষের পুরাণের কারখানায় ফরমাস দিলেই যে কোন গল্পকে পুরাণের ঢোলে একটা গড়িয়া দিতে পারে। কাপড়ের কারখানা করিতে পারুক না পারুক কিন্তু পুরাণের কারখানা তৈরী করিতে পণ্ডিত বাবাজীরা খুব মজবুত তা সে যে ঢোলের হউক না কেন। টাকা দিলে Lord Curzon ও Dyre পুরাণও তৈরী করা যাইতে পারে। এইজন্য পুরাণের সব অংশ গ্রহণ করা যায় না এবং গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য অংশ সকল অতি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়।

শিবলিঙ্গ পূজা

এখন ভারতবর্ষের সর্বত্র শিবলিঙ্গ পূজা হইয়া থাকে। ইহা অনেকটা cylinder-এর আকৃতি এবং তাহাতে proboscis আছে। অর্থাৎ একটা স্থাণু ও একটা গৌরীপট্ট। ভুবনেশ্বরে এবং কাশীতে কেদারের মন্দিরে ইহার একটু অন্যতর রূপ। কবে এই শিবলিঙ্গের পূজার প্রচলন হইল ইহাই প্রশ্ন। বহু প্রাচীন কালে স্থাণুর উল্লেখ পাইয়াছি। অর্জ্জুন যখন পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য শিবের আরাধনা করিয়াছেন সেখানে স্থাণুর উল্লেখ আছে। এবং 'স্থাণুবৎ' অনেক উল্লেখ রহিয়াছে। একটা গাছ কাটিলে ডাল না থাকিলে সেটা স্থাণু বা stump। আর একটা রহিয়াছে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা অনাদি লিঙ্গ। এস্থলে লিঙ্গ অর্থে অবয়ব বা আকৃতি। জ্যোতির্ময় লিঙ্গ—Effulgent form, অনাদি লিঙ্গ, In the form of Eternal Column. এই দুইটা শব্দ শিবের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে শিবকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—"শিবোহং, শিবোহং।" জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা অনাদি লিঙ্গ বিষয়ে নির্ধারণ করিতে হইলে রাজযোগে পাওয়া যায় যে নিম্নস্থান মূলাধার, তাহা হইতে মেরুদণ্ড দিয়া মস্তক পর্যন্ত অস্থি দিয়া সংযুক্ত রহিয়াছে। মস্তকের খুলি এই মেরুদণ্ডের অস্থির শেষ অংশ মাত্র। এই মেরুদণ্ডের ভিতর সুষুম্না বা অন্তরশূন্যা নাড়ী আছে, বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা। এই সুষুম্নার ভিতরে সূর্য-নাড়ী, ইন্দ্র বা বজ্র-নাড়ী এবং ব্রহ্ম-নাড়ী আছে। যখন অন্তর্নিহিত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয় তখন এই সুষুম্নার ভিতর দিয়া তাহার গতি হইয়া থাকে এবং সূর্য-নাড়ী অতিক্রম করিয়া বজ্র বা ইন্দ্র-নাড়ীতে প্রবেশ করে। তদন্তর ব্রহ্ম-নাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন সেই কুণ্ডলিনী শক্তি মস্তকের মধ্যস্থিত

সহস্রদল পদ্মে উত্থিত হয়। এইরূপ নানা বর্ণনা আছে। অধ্যাস বা Super-imposition প্রথা অবলম্বন করিলে অন্তরস্থিত বস্তু বহির্দেশে প্রতীয়মান হয় কারণ আমাদের বৃত্তি বহির্মুখী, সেই নিমিত্ত ভিতরকার জিনিস সম্মুখে দেখিতে পাই। এই কুণ্ডলিনী যখন ঊর্দ্ধগামী হয় এবং সম্মুখে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাকেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা অনাদি লিঙ্গ কহিয়া থাকে। রাজযোগের মতে এই মূলাধার, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ও সহস্রার এইরূপে বর্ণিত আছে। এই নিমিত্ত শিবলিঙ্গ করিতে হইলে একটা স্থাণু নির্মাণ করিতে হয় এবং তাহাতে একটি ত্রিকোণযুক্ত বেষ্টন করিতে হয় এবং স্থাণুর শিরোভাগে একটি গর্ত করিয়া কড়াই-এর মত একটি গোলাকৃতি মৃত্তিকা (বজ্র) রাখিতে হয়। পূজা করিবার সময় সেই বর্তুলাকার মৃত্তিকা খণ্ড (বজ্র)উন্মোচন করিয়া পূজা করিতে হয়। সুষুম্নার ভিতর দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্দ্ধগতি হইয়া সহস্রারে যায়। যাবার পথ আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই আবদ্ধ পথ বা আবরণীর উন্মোচন করিয়া পূজা করিতে হয়। নিজের ভিতরই শিবকে দেখিতে হয়। ইহাকে বলে চিদাকাশ। এখান হইতে মন যখন নিম্নগতি হয় তখন চিদাভাসে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ হইয়া আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়—এই তো রাজযোগ অনুযায়ী এক ব্যাখ্যা, ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। ইহাকে Phallic symbol বলিতে পারা যায় না। স্থাণু, জ্যোতির্ময় লিঙ্গ, অনাদি লিঙ্গ, সকলেরই সামঞ্জস্য ভাব থাকে।

আমি নিজে এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়া থাকি। ইহা খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হয় এবং ইহা নিন্দনীয় নহে।

বামাচারী সম্প্রদায়

বৌদ্ধযুগের শেষ অবস্থায় এক বামাচারী সম্প্রদায় উঠিল। তাহারা সব জিনিস নিজেদের মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিলেন এবং

প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলন, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হইল। Assyrian-দিগের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় যে, Ea (earth), Anu (firmament), আকাশ ও পৃথিবী সংযোগে সৃষ্টি হইতেছে। প্রথম অংশে অর্ধ-গোলাকৃতি একটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত এবং তাহাতে রেখা টানিত, সেটা আকাশ এবং ঢেউখেলান প্রস্তর করিত সেটায় সমতল ভূমি, পাহাড়, পৃথিবী পরিদর্শিত হইতেছে। তাহার পর দুটি প্রস্তর মূর্তি পাওয়া যায়, একটা পুরুষ ও অপরটা স্ত্রী with distinct male and female marks. স্ত্রী হইল প্রকৃতি বা Nature এবং অপরটি হইল পুরুষ বা Generating Energy. কৃষিকার্যে দেখান হইল যে, মৃত্তিকায় হলকর্ষণ করা হইল তাহাতে যে সীতা বা furrow হয় সেটা female mark, তাহাতে বীজ বা seed দেওয়া হয় সেইটা পরে মৃত্তিকা দিয়া ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয় এবং সময়ে তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। এই সকল সময়কে Season বা ঋতুকাল বলিত অর্থাৎ the ovary, the uterus and the chord যেরূপভাবে সন্নিবেশিত ও ovary-র ভিতরে seed যাইয়া যেরূপভাবে পরিবর্দ্ধিত উহারা সেইটি দেখাইত যেমন female beings-এর menses (রজঃ) হয়। তাহারা বলিত যে পৃথিবীর, Nature বা প্রকৃতির এইরূপ Season বা menses হয়। এইরূপে তাহারা সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিত। Male এবং female marks কে gate to procreation বা সৃষ্টির দ্বার বলিত। ভারতবর্ষে এক সময়েতে স্বভাবী (Naturist) বলিয়া এক সম্প্রদায় উঠিয়াছিল তাহাদের অল্পমাত্র উল্লেখ আছে, বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। সেইটাই পরে নাম বদলাইয়া বামাচারী হইল। এমন কি তাহারা বর্ণমালাকেও তাহাদের মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিল। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে বর্ণ সকল হইয়াছে ইহাই তাহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। যথা "ক" লিঙ্গ অনুরূপ, "খ" হস্তের অনুরূপ। উহাদের philosophy ছিল যে,

ব্রহ্মবীজ হইতে সৃষ্টিবীজ কেন আসিতেছে? নিকটে কোনটা? তোমার ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে হইল? আগে তোমার শরীর ও উৎপত্তি বিশেষভাবে জান তারপর ব্রহ্মে যাইবে। সৃষ্টিবীজ তোমার নিকটস্থ। এইজন্য সৃষ্টিতত্ত্ব আগে জান পরে ব্রহ্মতত্ত্বে আসিবে। এই নিমিত্ত তাহারা আগে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে বলে।

বামাচারীরা সৃষ্টিদ্বারকে মহা পবিত্র সংজ্ঞা দিল এবং ইহা যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল, বামাচারীর মতে এই যন্ত্রের পূজা হইয়া থাকে। এইজন্য যন্ত্র-পুষ্প ভিন্নভাবে নির্ণয় করিল, যথা জবা ফুল, অপরাজিতা ফুল ও করবী ফুল এবং অঙ্গুলী দিয়া যে মুদ্রা করিয়া থাকে তাহাতেও যন্ত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাণু ও মূলাধার পূর্বে যেরূপ ভাবে ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়া গৌরীপট্ট ও লিঙ্গ নামে অভিহিত হইল। গৌরীপট্ট হইল যন্ত্র এবং ইহাকে বিপরীত রতি বলিয়া থাকে। এই হইল বামাচারীদিগের প্রচলিত শিবপূজার ব্যাখ্যা।

কিন্তু প্রাচীন জ্যোতির্ময় লিঙ্গ বা শৈবভাব সাধারণের মন থেকে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। এজন্য বৈদেশিক কিংবা অপর কোন জাতি শিবপূজা করিতে আপত্তি করিয়া থাকে কিন্তু পুরাতন মত অবলম্বন করিলে দোষের কোন কথাই হইতে পারে না।

বামাচারীরা আপনার মত প্রচলন করিবার জন্য পূজার কোষা-কোষী ভিন্ন প্রকার করিল। লোকে যখন নিজ নিজ ইষ্টপূজা করিয়া থাকে তখন পঞ্চপাত্র ও একটি হাতার মত ছোট আধার লইয়া জল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বড় ভাবে পূজা করিতে হইলে কোষাখানি পদ্মের কোরক বা কুসুমস্তর-পাপড়ির ন্যায় কোষাতে বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকে। অর্থাৎ অগ্রভাগটা সংযুক্ত ও একাগ্র। এই হইল বিষ্ণুপূজার সাধারণ কোষার আকৃতি। কিন্তু শক্তিপূজার কোষা অপর প্রকার

হয়। ইহা যন্ত্র বা গৌরীপট্টের স্বরূপ। তন্ত্রের মত বা বামাচারী-দিগের মত এইরূপে প্রত্যেক বস্তুতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে বামাচারীরা সকল বস্তুকেই তাহাদের নিজ মত দিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের মতে শালগ্রাম Testis, দূর্বাঘাস hair on the genital part, স্থাণু male mark ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা কিরূপে হইল এবং ধীরে ধীরে কিরূপে সমস্ত সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল বলা দুঃসাধ্য। এই সকল পূজায় রক্ত চন্দন ব্যবহার হয়, শ্বেত চন্দনের তত আবশ্যক হয় না।

পুরী বা ভুবনেশ্বরে যে সকল মন্দিরের গায়ে যে সকল প্রতিকৃতি দেখিয়া সাধারণ লোক ঘৃণা করেন, সে সকল বামাচারীদের যন্ত্র। তাহারা অতি শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া এক সময় সেই সকল মূর্তিকে পূজা করিত। এসব কথা অধিক কহিবার আবশ্যক নাই, তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে উড়িষ্যাদেশের লোকনাথের মূর্তির মন্দির স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত হইয়াছে। The uterus, the ovary, and the canal ঠিক পরিদর্শিত হইয়াছে। স্বাভাবিক passage যেমন একটু curve বা বক্রভাবে আছে, নাট মন্দির হইতে গর্ভগৃহে যাইতে যে পথ আছে সেটা ঠিক সেইভাবে ঈষৎ বক্র। সমস্ত মন্দিরটি হইতেছে একটি যন্ত্র বিশেষ। এককালে বামাচারীদিগের ইহা এক বিশেষ স্থান ছিল।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে শিবের দুই অংশ আছে, এক অংশ বিষ্ণু ভাবে পূজা হয়; সেইদিকে তুলসী পত্র ও শ্বেত চন্দন ব্যবহৃত হয়, অপর দিকটি বিল্বপত্র দিয়া পূজা হয়। Dr. Rajendra Lal Mitra-র বইতে প্রথম এই বিষয়ে উল্লেখ পাইলাম। এবং নিজে গিয়া দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম যে প্রস্তরখানি male mark-এর অনুরূপ হইয়াছে। The two ridges and the hollow canal representing the natural cavity and the two parts,

the male marks. এখানেও গৌরীপট্ট ইত্যাদি সবই আছে। কাশীর কেদারের মন্দিরেও শিবের ঠিক এইরূপ অবয়ব আছে। বামাচারীরা প্রকৃতিকে একেবারে অনুরূপ প্রদর্শন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্য অনেক সম্প্রদায় এই বামাচারীদিগের বিরোধী-পন্থী হইয়া উঠিল। কিন্তু স্থাণুর পূজা বহু প্রাচীন এইজন্য সকল সম্প্রদায় ইহার পূজা করে। কিন্তু বামাচারীদের যে সকল ব্যাখ্যা লইতে হবে এইরূপ কোন কারণ বা যুক্তি নেই। জ্যোতির্ময় লিঙ্গ প্রশান্ত ভাব। এইভাবে স্থাণু বা মূলাধারের পূজা করা যাইতে পারে। সুষুম্না হইতে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া চিদাভাস হইতে চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই আত্মার পূজা প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। বামাচারীদের মত গ্রহণ করা অনাবশ্যক।

এস্থানে ইহা বক্তব্য যে, তন্ত্র স্বতন্ত্র, বামাচার স্বতন্ত্র। তন্ত্র অর্থে system কিন্তু বামাচারী ভিন্নপন্থী হইয়া উঠিল এবং পরে তন্ত্র বা বামাচারী প্রক্রিয়া দুয়ে মিলিয়া যাইতে লাগিল। ইয়োরোপে মধ্যযুগে Rosicrucian নামে এক সম্প্রদায় উঠিল এবং ইহারা একটা ক্রশ রাখিত এবং ডাণ্ডার দুদিকে দুই লাল গোলাপ দিত। ইহা হইল তাহাদের যন্ত্র-পুষ্প। তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে অনেক প্রক্রিয়া করিত কিন্তু বাহ্যতঃ খ্রীষ্টান ছিল। এই নিমিত্ত কোন কোন পণ্ডিতের এরূপ মত যে খ্রীষ্টানদের ক্রশ হইতেছে একটা যন্ত্র। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন। যদিও অপর সম্প্রদায়রা একথা স্বীকার করেন না। যাহোক এরূপ একটা মত আছে। শিবপূজার যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল।

কামাখ্যা পূজা

কামরূপ এককালে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। রাজ্যের পরিধি

কতদূর ছিল তাহা এখন স্থির করা যায় না। এক প্রতাপশালী রাজ্য হিসাবে ইহার অনেক উল্লেখ আছে। এই কামরূপে কামাখ্যার মন্দির এবং অম্বুবাচীর প্রথা এইখান হইতে উদ্ভূত হয়। অম্বুবাচীর প্রথা বাংলাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিমে দেখি নাই। গল্পটা হইতেছে the earth has menses as the animals have. অপর জীবের ন্যায় পৃথিবীরও ঋতুকাল হইয়া থাকে। সেইজন্য আষাঢ়-মাসে অনেকে কামাখ্যায় পূজা করিতে যান। বাংলাদেশের বিধবারা তিন দিবস গরম কোন জিনিস খান না। এই তো হ'ল বাংলাদেশের প্রথা। কিন্তু পুরাতন পুস্তকে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে বলিয়া স্মরণ হয় না বা ভারতবর্ষের অপর কোথাও এ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। Phoenician-দের এরূপ একটি প্রথা ছিল, Milton তাহার উল্লেখ করিয়াছেন "Sidonian virgins pay their vows and song." পাহাড়ের গা দিয়া গৈরিক বর্ণ জল পড়ে এবং তিন দিবস ফিনিসিয়ান কন্যারা নানাপ্রকার উৎসব করিয়া থাকে। পুনিকদিগের গ্রন্থ এখন সকলই বিনষ্ট হইয়াছে এবং অল্পমাত্র যাহা আছে তাহাতে এই প্রক্রিয়ার কিছু উল্লেখ আছে। আমি যখন Tripoli (Syria) অর্থাৎ Antioche-এর সন্নিকটস্থ শহরে (যেটা Sidon হইতে কিছু দিবসের পথ) বাস করিতেছিলাম সেখানকার ইংরাজী ও French জানা কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত আমার এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়। একজন যদিও বর্তমানে খ্রীষ্টান কিন্তু ফিনিসিয়ান-এর উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, এই পূজা-স্থানটি Sidon-এর কাছে নয়, ত্রিপোলী হইতে কয়েক মাইল দূরে। এখন খ্রীষ্টান ও মুসলমান হওয়ায় সে-স্থানে পূজাদি কিছু হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রবাদ এখনও বিদ্যমান আছে। কামাখ্যায় এই পূজা বোধ হইতেছে বিদেশ হইতে আসিয়া এই দেশে প্রচলন হয় এবং এখন জাতীয় পূজা বলিয়া পরিগণিত

হইতেছে কারণ তন্ত্রের অনেক পূজা চীনদেশের বা বর্হিভারতের পূজা বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং পণ্ডিতদিগের মতে তন্ত্রের কোন কোন স্থলে চীন শব্দ রহিয়াছে। চীনভাষায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা এই সকল শব্দকে চীনভাষার শব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন; এই সকল বিষয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের আলোচনার বিষয়।

কালী

"কালী কবালী মনোজবা চ ধূম্রাক্ষী স্ফুলিঙ্গিনী লোল জিহ্বা" এইটা তো পুরাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। হোম শিখাকে কালী নামে অভিহিত করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই উৎপত্তি হইতে বাকীটা হইয়াছে। অগ্নিশিখার তলায় শ্বেতবর্ণ ভস্ম পড়িয়া থাকে, বোধহয় ইহাই পরবর্তীকালে শিবকালীরূপ ধারণ করিয়াছে। তারপর যখন তন্ত্রের ভাব প্রবল হইল তখন সব জিনিসের সেইমত ব্যাখ্যা হইল। এবং তখন হইল—"কভু এলোকেশী উলঙ্গিনী ধনী বরাভয়করা ভক্ত-মনোহরা শবোপরি নাচে বামা"—ক্রমে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ হইল। বিষ্ণু-শর্মা যখন পঞ্চতন্ত্র লেখেন তখন অনেক স্থলে চতুর্ভুজ বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। বোধ হইতেছে তখনই প্রথম চতুর্ভুজের ভাবটা প্রবর্তিত হইল। এই লোল জিহ্বার ভাবটার পরে বহুপ্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং চিন্ময়ী, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্ম-আবরণী, আদ্যাশক্তি ইত্যাদি বহুভাবের ও রূপের ব্যাখ্যা হইয়াছে; এবং আর এক মত আছে যে আদ্যাশক্তি 'সৃষ্টি' উৎপন্ন করিতেছেন এবং তাহাই আবার ধ্বংস করিতেছেন। যাহা হউক চণ্ডীর সময় হইতে প্রাচীন ভাবগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণভাবে পরিণত হইল এবং কালীর সংহারিণী ভাবটা প্রযুজ্য হইল। মহাভারতে সত্যবতীর কথা যখন ভীষ্ম উল্লেখ করিতেছেন তখন মাতা কালী এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ইহা হইতে বুঝা যায় যে,

সত্যবতীর আসল নাম কালী এবং শান্তনুর মহিষী হওয়াতে সত্যবতী এই উপাধি হইল যেমন পরবর্তীকালে মেহেরউন্নিসার নাম নূরজাহান হইয়াছিল। যাহা হউক এই সৃষ্টি ও সংহারিণীর ভাব আমরা কালীপূজাতেও পাই। 'জরথুষ্ত্র' দুইটি স্বতন্ত্র ভাব প্রণয়ন করিলেন। সাপন্দমন্নু, আঙ্গারমন্নু বা একটি হইল মাজদা আহুর ও অপরটি হইল অহ্রিমান। ইহুদিদিগের ভিতর এই ভাবটি রূপান্তরিত হইয়া good god বা Jehovah এবং bad god বা Satan হইল অর্থাৎ এই দ্বন্দ্বভাবটি উভয় সম্প্রদায় পোষণ করিলেন। এই দ্বন্দ্বভাবটির ভিতর এক অংশ শ্রেষ্ঠ এবং অপর অংশ অপকৃষ্ট এবং ইহা শাশ্বত বা অনাদিকাল রহিবে, একে অপরকে জয় করিতে পারছে না বা আপনার করে লইতে পারিতেছে না। গ্রীক বা রোমানদিগের ভিতর এই নিত্যদ্বন্দ্বভাবের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহারা সাধারণতঃ Jupiter, Juno, Apollo, Aphrodite, Ceres ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা করিত, রোমানরা বিশেষ ভাবে Bona Dea বা Magna Mater-এর পূজা করিত। নিত্য দ্বন্দ্বভাবের বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহা শুধু জরথুষ্ত্র সম্প্রদায় ও ইব্রিয়দিগের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে।

এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে জরথুষ্ত্রের পূর্বে পারসীকদের মধ্যে এভাব ছিল না। কারণ এভাব প্রণয়ন করায় এক ঘাতক অগ্নিগৃহের (আগিয়াধির) মধ্যে জরথুষ্ত্রকে হত্যা করে। বোধহয় জরথুষ্ত্রই নতুন ভাব প্রণয়ন করেন। সাধারণ যাজকরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করায়। কিন্তু পূর্বে কি ভাবের পূজা হইত তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু এই দুই-এর দ্বন্দ্বভাব একীভূত হইয়াছে। সৃষ্টি ও সংহার এক কেন্দ্র হইতেই হইতেছে। অতি শুদ্ধাচার ও অতি অনাচার এক কেন্দ্র হইতে হয়। আদ্যাশক্তির ভাব অতি গভীর। এই ভাবটি ভারতের অভিনব ভাব

এবং যে-সকল দর্শনশাস্ত্রের তর্ক-যুক্তি অন্য উপায়ে সমাধান হয় না আদ্যাশক্তি বা Cosmic Energy-কে এই ব্যাখ্যায় পরিণত করিলে সামঞ্জস্য ভাব আসিয়া থাকে। এই কালীর ভাব কোনমতে হীনভাব বা ঘৃণিত ভাব বলা যাইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ ধ্যানের বস্তু, কথাবার্ত্তা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ ভাবে বলা চলে না তবে প্রকরণ হইতেছে তন্ত্রের মতে।

কালীপূজার মধ্যে কতক অংশ ক্ষেমঙ্করী ও অপর অংশ ভয়ঙ্করী। ক্ষেমঙ্করীর পূজা বাটীতে হইয়া থাকে, তাহার ভিতর বীরাচার ও পশ্বাচার এই দুই প্রকরণ আছে। ভয়ঙ্করীর মূর্তি বাস্তুভিটায় করিতে দেয় না, অনেক স্থলে গ্রামেও চলে না। গ্রামের প্রান্তে বা শ্মশানে এই পূজা হইয়া থাকে, তবে অতি প্রচ্ছন্নভাবে। ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও বগলা মূর্তি ভয়ঙ্করী। ইহা সকলের নহে এবং সাধারণ লোকে ইহার পূজা করে না। তারামূর্তি কেহ কেহ নিজের ইষ্ট বলিয়া পূজা করে। কিন্তু প্রকাশ্য পূজায় তারামূর্তি অতি বিরল। আমি শুধু এইরূপ একখানা প্রতিমা পূজা হইতে দেখিয়াছি। কালীপূজায় হোমের একটা বিশেষ মন্ত্র আছে। যথা, 'দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটী-পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।

ভয়ঙ্করী ইত্যাদি মূর্তি বা পূজার কবে প্রচলন হইল তাহা স্থির করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যখন বামাচারীদের বেশ প্রভাব হইয়াছিল তখন এই সকল পূজা হয়। বিশেষ এক বৈদিক প্রক্রিয়া ও হোম দিবাভাগে হইয়া থাকে। সূর্যের সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক এবং অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক প্রক্রিয়া শুক্লপক্ষে হয়। কিন্তু অমাবস্যায় নিশাকালে বৈদিক প্রক্রিয়ার প্রচলন নয়। এই তন্ত্রের প্রক্রিয়ায় পাইতেছি মোহা-ঘোরা মহানিশা। সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের শেষ অংশে চীন, তাতার

প্রভৃতি অনেক দেশের সহিত ভারতীয়দের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। বোধ হইতেছে চীন, তাতার হইতে এই সকল প্রক্রিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে তর্ক-যুক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া আধুনিক জাতীয় ভাবে পরিণত হইয়াছে কারণ কিছুদিন পূর্বে Mongolia-র Urga নগরে প্রধান লামার নাম 'তারানাথ' সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। তিব্বত ও তন্নিকটস্থ স্থানে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বহুল প্রচলন আছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে বশিষ্ঠ চীন দেশ হইতে অনেক বিষয় শিখিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চীন হইতে তন্ত্রের পূজার স্রোত আসিয়াছিল। সেইজন্য কামাখ্যা, তন্ত্রের একটা বিশেষ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আবার Punic-দের হইতে অনেক ভাব আসিয়াছে। সিন্ধুনদীর মুখে পাতাল (পোতালয়) নামে প্রাচীন এক বন্দর-নগর ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে এবং আলেকজাণ্ডার-এর বিজয়-গ্রন্থে এই Patala বা পোতালয়ের অনেক উল্লেখ আছে। এই স্থানে নানা জাতি আসিয়া ব্যবসা করিত বিশেষতঃ ফিনিসিয়ানেরা। সম্ভবতঃ এই Punic-দের মধ্য হইতে বামাচারীভাব ভারতে আসিয়াছিল। গুজরাটে অদ্যাপি চলীপূজা হইয়া থাকে। চলী-অর্থে কাঁচুলী। ইহা ভৈরবী পূজার নামান্তর। Damascus-এর সন্নিকটস্থ Hama ও Homes নগরের কাছে নুসেরী নামে এক সম্প্রদারের লোক বাস করে। আমি যখন সেই স্থানে বাস করিয়াছিলাম নুসেরীদিগের সহিত দোভাষীর সাহায্যে অনেক কথা কহিয়াছিলাম এবং দেখিলাম তাহারা প্রাচীন Baal, Ashtoreth, Moloch ইত্যাদির পূজা করিয়া থাকে তবে নামটা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। শয়তান শব্দ তাহারা ব্যবহার করে না। শয়তানকে মালীক-তায়োয়ুক বা ময়ূররাজ (Peacock Royal) বলিয়া সম্বোধন করে। ইংরাজীতেও ইহাদের বিষয়ে কয়েকখানি

পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। ভৈরবাচক্রের সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ প্রাচীন পুনিকদিগের পূজা নামান্তর করিয়া অদ্যাপি রাখিয়াছে। সেইজন্য বলিতেছি পাতাল বন্দরে পুনিকরা আসিয়া তাহাদের ভাব বিকীরণ করিয়াছিল এবং অদ্যাপি তাহা রহিয়াছে। এই যে কালীপূজার ভয়ঙ্করী মূর্তি ইহা বোধহয় বৌদ্ধযুগের শেষ সময়ে প্রচার হয় এবং সেইজন্য নিভৃতে নিশাকালে অমাবস্যায় হইয়া থাকে এবং যন্ত্রপুষ্প তৎসংক্রান্ত উপকরণ দিয়া পূজা হয়। সম্ভবতঃ ইহা প্রথমে গুপ্ত বিদেশীভাব ছিল পরে পরিমার্জিত ও সংশোধিত হইয়া জাতীয় ভাবে পরিণত হইয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের অন্যস্থানে এই সকল পূজা-পদ্ধতি দেখি নাই। ভালমন্দ এসব বিচার করা এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। কারণ আমি নিজে শক্তি উপাসক। তবে ঐতিহাসিক সম্পর্ক দেখান উদ্দেশ্য সেইজন্য নানা দেশের সহিত সম্ভবতঃ কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা দেখাইবার অল্পমাত্র প্রয়াস করিলাম।

জগদ্ধাত্রীপূজা

শারদীয়া ও বাসন্তীপূজায় যেমন তিন তিথি আবশ্যক হয়, জগদ্ধাত্রীপূজায় একদিনে তিন তিথি পাইয়া থাকে; এবং একদিনে তিন পূজা হইয়া থাকে। প্রচলিত প্রবাদ যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সভাসদ পণ্ডিতদিগের অনুমতি লইয়া এই পূজার প্রণয়ন করেন। ইহা দুর্গা-পূজার এক নামান্তর বলা যাইতে পারে। এইরূপ দেখিয়াছি যে প্রবাদ অনুযায়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে অনেক প্রকার শক্তি বিগ্রহের পূজা হয়, যথা রাজবলহাটে 'রাজবল্লভী'।

অন্নপূর্ণাপূজা

প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃতি সক্রিয় এইভাব ক্রমে পরিবর্জিত হইল। তারপর যখন শক্তিপূজার আধিক্য হইল তখন পুরুষকে খর্ব করিয়া শক্তির প্রাধান্য দেখান হইল। শক্তি সব করিতে পারে। পুরুষ শুধু নিমিত্ত কারণ। এই উপাখ্যানটি পৌরাণিক ভাবে ফেলিলে অন্নপূর্ণা পূজাকে গল্পে পরিণত করা যায়। শিব বড় কি শক্তি বড় এই বলিয়া হর-পার্বতীর মধ্যে বিবাদ হইল। ভোলা মহেশ্বর পার্বতীকে না মানিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করিতে চলিলেন। কিন্তু কোন স্থানে ভিক্ষা পাইলেন না। মনে করিলেন লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেখানে যাইলেন কিন্তু সেখানেও কিছু পাইলেন না। আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যেদিকে অভাগা চায় সাগর শুকায়ে যায়, হ্যাদে লক্ষ্মী হ'ল লক্ষ্মীছাড়া।" অবশেষে শুনিলেন যে, কাশীতে পার্বতী অন্নপূর্ণা হইয়া ভিক্ষা দিতেছেন, তাই সেখানে যাইলেন ও ভিক্ষা পাইলেন। এ গল্পের অর্থ হইতেছে শক্তিই সব, এবং শিব নিমিত্ত মাত্র, এই পূজা তন্ত্রের শেষ অবস্থায় হইয়াছিল। বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। অনুমান তিনশত বা চারিশত বৎসর পূর্বে ইহার প্রণয়ন বা প্রচলন হইয়াছিল।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

শিব ওঁ!

Books by Sri Mohendra Nath Dutt

ENGLISH

Religion. Philosophy. Psychology		Price
1.	Natural Religion	1·50
*2.	Energy	—
3.	Mind (2nd. Edn.)	2·50
4.	Mentation	2·50
5.	Theory of Vibration	2·50
6.	Cosmic Evolution – Part I	4·50
7.	Cosmic Evolution – Part II	4·00
8.	Triangle of Love	2·00
9.	Formation of the Earth	2·50
10.	Metaphysics (2nd. Edn.)	2·50
11.	Theory of Motion	2·50
12.	Biology – Board bound	5·00
	,, – Paper bound	4·50
13	Logic of Possibilities	4·00
14.	Devotion	4·00
15.	Ego	3·00
16.	Theory of Sound	3·50
17.	Theory of Light	5·00

Art & Architecture

1.	Dissertation on Painting (2nd. Edn.)	4·00
2.	Principles of Architecture	4·00

Literary Criticism, Epic etc.

1.	Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd. Edition)	1·50
*2.	Kurukshetra	—
3.	Nala and Damayanti	5·00

Social Sciences

1.	Lectures on Status of Toilers	2·50
'2.	Homocentric Civilization	2·50
3.	Reflections on Society	2·00
*4.	Lectures on Education	—
5.	Federated Asia	4·50
6.	National Wealth	5·50
7.	Nation	2·00
8.	New Asia	1·50
9.	Rights of Mankind	1·00

* Books marked with asterisks are out of print.

*10.	Social Thoughts	—
11.	Temples and Religious Endowments	0·50
*12.	Status of Women (with Bengali Translation)	
13.	Toilers Republic	0·50
*14	Reflections on woman (Published by Saradeswari Ashram)	—

HINDI

1.	Nari-Adhikar (Translation of "Status of Women")	0·75
2.	Manab-Kendrik Sabhyata (Translation of Homocentric Civilization)	1·00

Books Awaiting Publication.

1. (a) Langu.ge and Grammar
   (b) Rhetoric
2. Dissertation on Poetry
3. Philosophy of Religion
4. Aetion
5. Society
6. Ethics (in press)
7. Lectures on Philosophy

বাংলা

অনুধ্যান, দর্শন প্রভৃতি		মূল্য
১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (৪র্থ মুদ্রণ)	৬·০০
২।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড, (৩য় মুদ্রণ)	৩·৫০
৩।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ২য় খণ্ড, (২য় মুদ্রণ)	৩·২৫
৩ (ক)।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড	২·৫০
৩ (খ)।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, (২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)	৫·৫০
৪।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড, (৩য় মুদ্রণ)	৪·০০
৫।	ঐ ২য় খণ্ড (৩য় মুদ্রণ)	৩·৫০
৬।	ঐ ৩য় খণ্ড (৩য় মুদ্রণ)	৩·৫০
৭।	স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী	২·০০
৮।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় মুদ্রণ)	২·০০

৯।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩.৫০
১০।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় মুদ্রণ)	১.০০
১১।	ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	১.৫০
১২।	দীন মহারাজ	১.০০
*১৩।	গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	—
১৪।	সাধুচতুষ্টয় (২য় সংস্করণ) (সারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত)	১.২৫
১৫।	জে. জে. গুডউইন (স্বামীজীর ক্ষিপ্র লিপিকার)	১.৫০
১৬।	গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান (বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও চিত্র সন্নিবেশিত)	৫.০০
*১৭।	মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা)	—
*১৮।	ব্রজধাম দর্শন	—
১৯।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	২.০০
২০।	বদরীনারায়ণের পথে	৩.০০
২১।	মায়াবতীর পথে	২.০০
*২২।	তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান	—
২৩।	মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	৪.০০
*২৪।	অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	—
*২৫।	মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম)	—
২৬।	ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন	২.৫০

কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি

*১।	বাংলা ভাষার প্রধাবন	—
২।	পশুজাতির মনোবৃত্তি	১.০০
৩।	পাশুপত অস্ত্রলাভ (কাব্য)	৫.০০
৪।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	—
৫।	সঙ্গীতের রূপ	১.৫০
৬।	নৃত্যকলা	১.০০
৭।	শিল্প প্রসঙ্গ	(প্রকাশের পথে)
*৮।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার (২য় মুদ্রণ)	—
*৯।	বৃহন্নলা (কাব্য)	—
১০।	প্রাচীন ভারতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী	৩.৫০

* তারকা চিহ্নিত পুস্তকগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না।

১১। বিবিধ কবিতাবলী ৫০

১২। কাব্য অনুশীলন ১ ০০

১৩। কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা ৪·০০

১৪। প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহনবাদ ১·৫০

১৫। প্যালেষ্টাইন ভ্রমণকাহিনী ও ইহুদী জাতির ইতিহাস ১·৫০

*১৬। উষা ও অনিরুদ্ধ —

Allied Publications

১। স্মৃতি-তর্পণ ৩·০০
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

২। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ৩·০০
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক প্রণীত

৩। স্মৃতি-কথা ১·২৫
শ্রীসাতকড়ি মিত্র প্রণীত

৪। আমার দেখা মহিমবাবু ১·০০
শ্রীরঘুনাথ বসু

৫। বিবিধ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ ২·৫০
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

৬। শতবার্ষিকী লেখমালা ৫·০০

*৭। পুণ্যদর্শন মহেন্দ্র নাথ প্রসঙ্গে —
শ্রীসত্যচরণ দত্ত

৮। সংলাপে মহেন্দ্রনাথ ১ম খণ্ড ৮·০০
" " ২য় খণ্ড ১০·০০
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু

গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া মহেন্দ্র দর্শনের ভূমিকায় পরিচিত হউন।

9. Labour and Capital 1·00 P.
Sri R. K. Ghosh

10. Education in Free India 0 37 ,,
Sri R. K. Ghosh

11. Dialectics of Land-Economics of India 6·50 ,,
Sri Bhupendra Nath Dutta
A. M. (Brown) Dr. Phil (Hamburg)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১। দৌত্যকার্য্য